শ্রীঅরবিন্দ

কর্ম্মযোগী

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম
পণ্ডিচেরী

প্রকাশক—শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম
পণ্ডিচেরী

অনুবাদক—শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ
নভেম্বর, ১৯৫৪

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম প্রেস
পণ্ডিচেরী

519/54/1000

সূচীপত্র

কর্ম্মযোগীর আদর্শ

একটা নেশন আজ ভারতবর্ষে চোখের সম্মুখে দেখিতে দেখিতে গড়িয়া উঠিতেছে—এত দ্রুত এত স্পষ্ট তাহার কাজ চলিয়াছে যে কাজের বাহিরের ধারাটি যে কেহ ইচ্ছা করিলেই অনুসরণ করিতে পারিবেন ; তবে যাঁহার দরদ আছে, দৃষ্টি আছে তিনিই আবিষ্কার করিতে পারিবেন কাজের পিছনে আছে কোন কোন শক্তি, কি কি উপকরণই বা সেখানে ব্যবহার করা হইতেছে, কোন রেখাবলী ধরিয়া তাহার ভবিষ্যতের দিব্য রূপ মূর্ত্ত হইয়া উঠিতেছে। এই নেশন কিন্তু প্রকৃতির কর্ম্মশালা হইতে আনকোরা তৈয়ার হইয়া আসিতেছে না, আধুনিক অবস্থাচক্রের দৌলতে সৃষ্ট তাহা নূতন একটা জাতিও নয়। পৃথিবীর মধ্যে প্রাচীনতম একটা জাতি, শিক্ষা-দীক্ষায় গরিষ্ঠ একটা সমাজ—অজেয় যাহার প্রাণশক্তি, অপ্রমেয় যাহার বিপুল সৃষ্টি, সুগভীর যাহার জীবনধারা, অপরিসীম যাহার সামর্থ্য—সে ভিন্ন গোষ্ঠী হইতে, বিদেশের বিবিধ ভাণ্ডার হইতে বহুতর শক্তির বীজ নিজের মধ্যে এতদিন সঞ্চয় করিয়া আসিয়া আজ চাহিতেছে সংহত সজীব রাষ্ট্রীয় ঐক্যে শরীরী হইতে, পূর্ণ বিকশিত মুঞ্জরিত হইয়া চিরকালের জন্য মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে। এই জাতি এযাবৎ অবশ্য ছিল সমানধর্ম্মা বহুতর নেশনের একটা সমষ্টি মাত্র—

এক জীবনধারা, একই শিক্ষাদীক্ষা সেখানে ছিল; আর এই মূল একত্বের জোরে চিরকাল ঐক্যের দিকে সে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে বটে; কিন্তু তাহার মধ্যে এত সৃষ্টির প্রাচুর্য্য ছিল যে নিত্য নূতন বৈচিত্র্যকে জন্ম দিতে দিতে একদিকে সে যেমন আরও খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়িয়াছে, অন্য দিকে তেমনি শুধু একটা দেশ নয় কিন্তু মহাদেশকেই সুশৃঙ্খলিত করিয়া তুলিবার পক্ষে যত অলঙ্ঘ্য বাধা তাহা সে সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে নাই। আজ সময় হইয়াছে, সেই সকল বাধা এখন দূর করা সম্ভবের মধ্যে আসিয়াছে। অতীতের সুদীর্ঘ ইতিহাসের ভিতর দিয়া আমাদের জাতিটি যে প্রয়াস করিয়া আসিয়াছে, আজ সেই একই প্রয়াস সে করিতে চলিয়াছে, কিন্তু সম্পূর্ণ নূতন রকমের অবস্থার মধ্যে। একটু গভীরভাবে ঘটনাচক্রের দিকে নজর দিলেই বুঝা যাইবে এবারকার সাফল্যে আর সন্দেহ নাই। কারণ, আমরা দেখিতেছি প্রধান প্রধান বাধাগুলিই দূর হইয়া গিয়াছে কিম্বা প্রায় দূর হইবার পথে চলিয়াছে। তবে আমাদের ব্যক্তিগত বিশ্বাসের মাত্রা কিন্তু আরও বেশি; আমরা বলিতে চাই, সফলতা আজ অবশ্যম্ভাবী—কারণ ভারতের স্বাধীনতা, ভারতের ঐক্য, মহত্ত্ব ও পূর্ণ সিদ্ধি জগতের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

দেশ-সেবক কর্ম্মযোগী যিনি তিনি এই শ্রদ্ধা লইয়া কর্ম্ম-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন, এই শ্রদ্ধাতেই নিরন্তর চলিবেন বাধা বিপত্তি যতই বিপুল, আপাতদৃষ্টিতে যতই দুর্লঙ্ঘ্য মনে হউক

না কেন, কখনও তাহাতে বিচলিত হইবেন না। আমাদের বিশ্বাস, ভগবান আমাদের সাথে—এই বিশ্বাসের জোরেই আমরা জয়ী হইব। আমাদের বিশ্বাস, মানবজাতি আমাদিগকে চাহিতেছে—মানুষের জন্য, দেশের জন্য, জাতির জন্য, ধর্ম্মের জন্য আমাদের অনুরাগ ও সেবা আমাদের চিত্তকে শুদ্ধ করিয়া তুলিবে, আমাদের কর্ম্মকে অনুপ্রাণিত করিয়া ধরিবে।

আমরা যে কাজের ভার লইব তাহা একান্ত বাহিরের নয়, তাহা অন্তরের, তাহা আধ্যাত্মিক। আমাদের লক্ষ্য শাসনযন্ত্রের কেবল রূপ-পরিবর্ত্তন করা নয়, কিন্তু একটা নেশনকে গড়িয়া তোলা। এই কাজের একটা অঙ্গ রাজনীতি, সন্দেহ নাই, কিন্তু একটা অঙ্গ মাত্র। আমরা শুধু রাজনীতি লইয়া ব্যাপৃত থাকিব না, কিম্বা সমাজ-সমস্যা, সাধন-শাস্ত্র, দর্শন, সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতির মধ্যে কোনটিকে সর্ব্বেসর্ব্বা করিয়া লইয়া চলিব না। কিন্তু এই সবগুলির ধারাকে একটি বস্তুর অন্তর্ভুক্ত করিয়া ধরিব—তাহার নাম "ধর্ম্ম", আমাদের দেশের ধর্ম্ম, যে-ধর্ম্ম হইতেছে বিশ্বের ধর্ম্ম। জীবন-গতির আছে যে একটা মহান ধারা, মানবজাতির ক্রমোন্নতির আছে যে একটা গভীর তত্ত্ব, আধ্যাত্মিক জ্ঞানের ও উপলব্ধির আছে যে বিচিত্র রহস্য—ভারতবর্ষ তাহার রক্ষক, তাহার বিগ্রহ, তাহার প্রচারক। এই জিনিষটিকেই বলা হইয়াছে "সনাতন ধর্ম্ম"। বিদেশের পরধর্ম্মের সহিত সংঘর্ষে ভারতবর্ষ তাহার সনাতন ধর্ম্মের জাগ্রত প্রাণটি হারাইয়া প্রায় শুধু কাঠামটি লইয়া বসিয়া আছে। কিন্তু ভারতের এই

কর্ম্মযোগীর আদর্শ

ধর্ম্মকে জীবনে মূর্ত্ত করিয়া যদি না চলা যায়, তাহার তবে কোনই অর্থ থাকে না। শুধু আবার জীবনে নয়, জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে তাহার প্রয়োগ করিতে হইবে। আমাদের সমাজ, আমাদের রাষ্ট্র, আমাদের সাহিত্য, আমাদের বিজ্ঞান, আমাদের ব্যক্তিগত প্রকৃতি ও প্রেরণা সকলের মধ্যে এই ধর্ম্মের প্রতিভা প্রবেশ করিয়া সকলকে নূতন ছাঁচে গড়িয়া তুলিবে। এই ধর্ম্মের মর্ম্ম বুদ্ধি দিয়া অনুধাবন করা, সত্য বলিয়া উপলব্ধি করা, হৃদয়কে তাহার সমুচ্চ প্রেরণার ছন্দে তুলিয়া ধরা, জীবনে তাহাকে মূর্ত্ত করিয়া ধরা—ইহারই নাম আমরা দিতে চাই কর্ম্মযোগ। ভারতবর্ষ এই যোগকে মানবজীবনের লক্ষ্যরূপে স্থাপিত করিবে, তাই আমরা মনে করি আজ সে জাগিয়া উঠিতেছে। এই যোগের দ্বারাই ভারতবর্ষ তাহার স্বাধীনতা, ঐক্য, মহত্ত্ব অর্জন করিবার, রক্ষা করিবার শক্তি ও সামর্থ্য পাইবে। আমাদের ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি দেখিতেছে একটা আধ্যাত্মিক বিপ্লব, স্থূলের বিপ্লব শুধু তাহারই প্রতিক্রিয়া প্রতিচ্ছবি। ইউরোপ অবশ্য স্থূল যন্ত্রেরই উপর অনেকখানি ভরসা রাখে। সামাজিক ব্যবস্থা দিয়া, রাষ্ট্রীয় শাসনপ্রণালী গড়িয়া সে মানবজাতিকে উদ্ধার করিতে চায়, তাহার বিশ্বাস পার্লামেন্টের একটি আইনের দ্বারা সে সত্যযুগ আনিয়া ফেলিবে। যন্ত্রপাতির খুবই প্রয়োজন আছে, কিন্তু যদি সে জিনিষটি হয় অন্তরস্থ পুরুষের, পিছনকার শক্তির বাহন বা অবলম্বন। ঊনবিংশতি শতাব্দীর ভারতবর্ষ রাষ্ট্রীয় মুক্তি, সামাজিক শুদ্ধি, আধ্যাত্মিক নবজন্মের জন্য

উদ্‌গ্রীব হইয়াছিল ; কিন্তু তাহাকে সকল বিষয়ে নিরাশ হইতে হইয়াছে ; কারণ, দেশের নিজস্ব যে অন্তর-পুরুষের প্রতিভা, যে কর্ম্মের ধারা, তাহা ভুলিয়া গিয়া সে পাশ্চাত্যের ভাব ও ভঙ্গী ধরিয়া চলিয়াছিল ; সে বিশ্বাস করিয়া বসিয়াছিল যে ইউরোপীয় শিক্ষা, ইউরোপীয় যন্ত্রপাতি, ইউরোপীয় শৃঙ্খলা ও সাজসজ্জা তুলিয়া আনিতে পারিলেই ভারতে আমরা পাইব ইউরোপের সমৃদ্ধি, সামর্থ্য, ক্রমোন্নতি। আজ বিংশ শতাব্দীতে আমরা উনবিংশ শতাব্দীর বিজাতীয় উদ্দেশ্য, আদর্শ, উপায় সব প্রত্যাখ্যান করিয়াছি, কেবল তাহাতে যে অভিজ্ঞতা হইয়াছে সেইটুকুই লাভ বলিয়া মানিয়া লইয়াছি। কিন্তু একমাত্র বর্ত্তমানকেই সর্ব্বেসর্ব্বা করিয়া আমরা কখনই তুলিব না। আমরা চক্ষু মেলিয়া দেখিব অগ্রে, দেখিব পশ্চাতে—পশ্চাতে অনুসরণ করিব আমাদের জাতির অতীতের সমস্ত ইতিহাস, সম্মুখে রাখিব যে মহোজ্জ্বল ভবিষ্যতের নবীন ইতিহাস ভাগ্যবিধাতা তাহাকে রচিয়া তুলিতে উদ্‌যুক্ত করিতেছে।

"কাউন্সিল"-আদির ক্ষমতা বাড়াইয়া দাও, "ইলেক্‌শন" পদ্ধতি স্থাপন কর, "ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন" আমরা চাহি—ইউরোপীয় রাষ্ট্রনীতির এই সব ধূয়া ধরিয়া চলিলে ভারতের যে রাষ্ট্রীয় মুক্তি হইবে, আমরা তাহা বিশ্বাস করি না। অবশ্য রাষ্ট্রনীতিক ক্ষেত্রে এই সকল জিনিষের কোন কোনটি হয়ত অস্ত্র হিসাবে আমাদের উপকারে আসিতে পারে—তাহা অস্বীকার করি না। কিন্তু আমরা অস্বীকার করি এই কথা যে অস্ত্র

হিসাবে বা লক্ষ্য হিসাবে তাহারাই সব, তাহাদের ছাড়া আর কিছু নাই। কারণ, আমরা দেখিতেছি যে ভবিষ্যৎ-সিদ্ধির উপর আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ তাহার সহিত, এ সব জিনিষের নেহাৎ গৌণ ও যৎকিঞ্চিৎ সম্বন্ধ ছাড়া সাক্ষাৎ সম্বন্ধ আদৌ নাই। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে এক পাশে একটি প্রদেশ মাত্র হইয়া থাকা অথবা ইউরোপীয় শিক্ষাদীক্ষার একটা উপশাখা হওয়াই যদি ভারতের নিয়তি হইত তবে ঐ সকল জিনিষকে যথেষ্ট বিবেচনা করিলে দোষের হইত না। কিন্তু এই ধরণের ভবিষ্যতের জন্য কোন প্রকার কষ্ট করিতে আমরা প্রস্তুত নহি। আমাদের বিশ্বাস ভারত তাহার নিজের স্বাধীন জীবন, স্বতন্ত্র শিক্ষাদীক্ষার পথে চলিয়া জগতের পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়াইবে; আর ইউরোপ যে সকল রাষ্ট্রনীতিক, সামাজিক, অর্থনীতিক সমস্যার সমাধান করিতে গিয়া ব্যর্থ হইয়া পড়িয়াছে ভারত সে-সকলের একটা সুষ্ঠু মীমাংসাই করিয়া দিবে—ইউরোপ সে-চেষ্টায় নিত্য নূতন মত পরীক্ষা করিয়া চলিয়াছে, এক বিফলতা হইতে আর এক বিফলতায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে, আর এই ব্যর্থ ব্যস্ত গতিকেই নাম দিয়াছে ক্রমোন্নতি বা "প্রগ্রেস"। আমাদের লক্ষ্য যেমন মহান, আমাদের উপায়ও হইবে তেমনি মহান; সেই লক্ষ্যসিদ্ধির উপযোগী উপায় আবিষ্কার করিবার ও প্রয়োগ করিবার শক্তি খুঁজিয়া পাইতে হইবে আমাদের নিজেদেরই অন্তরে, অনন্ত শক্তির উৎস যেখানে সেইখানে।

কর্ম্মযোগীর আদর্শ

আমরা বিশ্বাস করি না বাহিরের যন্ত্রটাকে পরিবর্ত্তন করিয়া, ইউরোপের অনুকরণে আমাদের সমাজকে সাজাইয়া দিলেই সামাজিক হিসাবে আমরা পাইব নবজন্ম। বিধবা-বিবাহ, বর্ণ-বিভাগের পরিবর্ত্তে শ্রেণীবিভাগ, পূর্ণ বয়সে বিবাহ, আন্ত-র্জাতিক বিবাহ, জাতিবর্ণ নির্বিশেষে এক পংক্তিতে আহার—সমাজ-সংস্কারকে এই যে সব মুষ্টিযোগ, তাহাতে হয় যন্ত্রটার মধ্যে এদিক ওদিক একটু পরিবর্ত্তন। ইহাদের দোষ বা গুণ যাহাই থাকুক, শুধু এই সমস্তেরই জোরে একটা দেশের প্রাণ বাঁচাইয়া রাখিতে পারা যায় না, অবনতির পতনের ধারা রুদ্ধ করা যায় না। অন্তরাত্মার স্পর্শই জীবন দান করিতে পারে—অন্তরে যদি আমরা মুক্ত হই মহান হই, তবেই রাষ্ট্র হিসাবে সমাজ হিসাবে আমরা পাইব মুক্তি ও মহত্ব।

এই আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্য, বল ও মহত্ব ফিরিয়া পাইতে হইলে আমাদের পাশ্চাত্যের ভাবে ধর্ম্ম করিতে হইবে কিম্বা গোঁড়া হিন্দুয়ানী অনুসরণ করিতে হইবে—এই বিশ্বাসও আমরা করি না। পাশ্চাত্য ধর্ম্মের লইয়াছে একটা সঙ্কীর্ণ ও স্থুলভ অর্থ, তাহা মানিলে সেই গণ্ডীটুকুরই মধ্যে রহিয়া নূতন নূতন সম্প্রদায় আমরা বাড়াইয়া তুলিব মাত্র; অন্য দিকে গোঁড়ামীর পথে, হিন্দুত্বের প্রাণ হারাইয়া তাহার বাহিরকার রূপ—দেহ ও সাজ-পোষাকটুকু যাবচচন্দ্র দিবাকরৌ করিয়া রাখিতেই আমাদের প্রয়াস হইবে। ফলতঃ, স্বাধীন চিন্তা, এমন কি জড়বাদের প্রাবল্য একটা অবস্থায় জগতের ক্রমগতির পথে নিতান্ত প্রয়োজনেরই

হইয়া দাঁড়ায়। এই রকমের সন্ধিযুগের পরেই দেখা দেয় ধর্ম্মজগতে চিন্তার ও অভিজ্ঞতার একটা নূতন সমন্বয়, সকল রকম অনুদারতাবর্জিত অথচ শ্রদ্ধায় ও তীব্রতায় পরিপূর্ণ একটা জগৎ-জোড়া ধর্ম্ম-জীবন—এক সত্যে তাহার অটুট অভিনিবেশ বলিয়া ধর্ম্মের যাবতীয় রূপই স্বীকার করিয়া লইতে তাহার কষ্ট হয় না। জগতের অন্তর-পুরুষ চলিয়াছে এমন একটি ধর্ম্মের দিকে যাহা বিজ্ঞানকে ও ভক্তিকে, নিরাকারবাদকে ও সাকার-বাদকে, খ্রীষ্টধর্ম্মকে, মুস্‌লিম ধর্ম্মকে, বৌদ্ধধর্ম্মকে একসঙ্গে আলিঙ্গন করিয়া ধরিয়াছে, অথচ এই সকলের একটিও তাহা নয়। আর আমাদের নিজের যেটি ধর্ম্ম তাহা একদিকে অবিশ্বাসের বা সন্দেহের চূড়ান্ত যেমন দেখাইয়াছে, অন্যদিকে তাহারই মধ্যে পাই আবার বিশ্বাসের বা শ্রদ্ধার পরাকাষ্ঠা। তাহাকে পরম সন্দিগ্ধ বলিতেছি এই জন্য যে তাহার মত এমন পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে বিচার বিতর্ক কেহ করে নাই, এমন নূতন নূতন পথে পদে পদে পরীক্ষা করিয়াও কেহ চলে নাই ; আর পরম শ্রদ্ধাবান ও আস্তিক বলিতেছি এই জন্য যে জগতের আর কোন ধর্ম্মে এত গভীর উপলব্ধি. অধ্যাত্ম-রাজ্যের এত রকমারি ও এমন স্পষ্ট জ্ঞান কেহ দেখাইতে পারে নাই। আমরা বলিতেছি একটা বৃহত্তর হিন্দুধর্ম্মের কথা—এই হিন্দুধর্ম্ম কোন বিশেষ নীতি-সূত্র বা কতকগুলি নীতিসূত্রের সমাবেশ নয়, তাহা প্রত্যক্ষ জীবনেরই একটি ধারা বা গতিভঙ্গী ; এই ধর্ম্ম অর্থ সামাজিক ব্যবস্থার কোন বিশেষ কাঠামো নয়, তাহা হইতেছে অতীতের

মধ্য দিয়া ভবিষ্যতের দিকে চলিয়াছে যে সামাজিক ক্রমবিকাশ তাহারই অন্তরস্থ ভাব ; এই ধর্ম্ম কোন-কিছুকে পূর্ব্বাহ্ণেই অগ্রাহ্য করিয়া রাখে না, তবে প্রত্যেক জিনিষকে উপলব্ধি করিয়া, পরীক্ষা করিয়া দেখিতে সে চাহে এবং উপলব্ধ ও পরীক্ষিত হইয়া গেলে পর তাহাকে অন্তরাত্মারই প্রয়োজনে ব্যবহার করে। এই উদার হিন্দুধর্ম্মেই আমরা দেখিতেছি ভবিষ্যতের সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা। এই "সনাতন ধর্ম্মের" বহুতর শাস্ত্র—বেদ, বেদান্ত, গীতা, উপনিষদ, দর্শন, পুরাণ, তন্ত্র, এমন কি বাইবেল ও কোরাণকে সে অগ্রাহ্য করিতে পারে না ; কিন্তু তাহার সত্যকার, তাহার অব্যর্থ অভ্রান্ত শাস্ত্র হইতেছে মানুষের হৃদয়ে, যেখানে অনন্তের অধিষ্ঠান। আমাদের এই অন্তরের যত আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা, সেইখানেই পাইব সকল দেশের সকল শাস্ত্রের প্রমাণ ও মূল, সেইখানেই রহিয়াছে জ্ঞানের প্রেমের ও ব্যবহারের বিধান, কর্ম্মযোগের প্রতিষ্ঠা ও অনুপ্রেরণা।

সুতরাং আমাদের লক্ষ্য ভারতকে গড়িয়া তোলা, কিন্তু জগতের সেবার জন্য। ভারতে আমরা নেশন প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিতেছি এই উদ্দেশ্যে। আমরা মানবজাতিকে বলিতেছি, "আজ সেই মাহেন্দ্র সন্ধিক্ষণ উপস্থিত যখন তোমাকে এক স্তর হইতে আর এক স্তরে উঠিয়া দাঁড়াইতে হইবে, জীবনের শুধু অন্নময় প্রতিষ্ঠান হইতে একটা উচ্চতর বৃহত্তর গভীরতর আয়তনে গিয়া পৌঁছিতে হইবে—মানবজাতি চিরকাল সেই লক্ষ্যেই যে চলিয়া আসিয়াছে। যে সকল সমস্যা মানুষকে এতদিন

বিভ্রান্ত করিয়াছে, তাহাদের মীমাংসা হইতে পারে এক অন্তরের সাম্রাজ্য অধিকার করিয়া—সুখের ও বিলাসের সেবায় প্রকৃতির শক্তিরাজিকে নিযুক্ত করিয়া নয়, কিন্তু বুদ্ধিবলের, অন্তরাত্মার বলের উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়া, অন্তর্জগতে ও বহির্জগতে মানুষের স্বাধীনতা স্থাপন করিয়া, স্থূল প্রকৃতিকে ভিতর হইতে জয় করিয়া। এই ব্রতের জন্য এসিয়ার জাগরণ প্রয়োজন, তাই এসিয়া জাগিতেছে। এই ব্রত ভারত স্বাধীন ভারত মহান না হইলে কখনও উদ্‌যাপিত হইতে পারে না, তাই ভারত আজ তাহার অবশ্যম্ভাবী স্বাধীনতা ও মহত্ত্বের অধিকার চাহিতেছে। এই অধিকার তাহার সম্পূর্ণ করায়ত্ত হউক—তাহাতে সমস্ত মানবজাতিরই উপকার, এমন কি, ইংলণ্ডও সে-উপকারের ভাগ হইতে বঞ্চিত হইবে না।"

আমরা ভারতকে বলিতেছি, "ভগবান চাহিতেছেন, আমরা আমরাই রহিব, ইউরোপ হইয়া পড়িব না। এতদিন আমাদের চেষ্টা ছিল আর একজনের জীবন ধর্ম্ম-অনুসরণ করিয়া আমরা নবজীবন পাইব! এখন আমাদের ফিরিয়া দাঁড়াইতে হইবে, নিজেদের অন্তরে জীবনের ও শক্তির উৎস খুঁজিয়া পাইতে হইবে। অতীতকে জানিতে হইবে, উদ্ধার করিতে হইবে, ভবিষ্যতের সেবায় নিযুক্ত করিবার জন্য। আমাদের কাজ সর্ব্বপ্রথমে আত্মোপলব্ধি। ভারতের যে সনাতন জীবনধারা ও স্বভাব তাহারই ছাঁচে আমাদের সকল জিনিষ ঢালিয়া গড়িতে হইবে। কর্ম্মযোগীর উদ্দেশ্য তাই দেশের ধর্ম্ম, দেশের সমাজ, দেশের

দর্শন, রাজনীতি, সাহিত্য, শিল্প, ব্যবহার, বিজ্ঞান, সকল রকম চিন্তাসম্পদ—যাহা কিছু আমাদের বলিয়া ছিল ও আছে, সে সমস্তেরই অন্তরের সত্য বলিয়া অনুধাবন করিয়া দেখা। নিজের কাছে নিজে আমরা নিঃসংশয়ে যেন বলিতে পারি, 'এই আমাদের ধর্ম্ম।' পাশ্চাত্যের শিক্ষাদীক্ষা পর্য্যবেক্ষণ আমরা করিব, কিন্তু ভারতের চিন্তা, ভারতের জ্ঞানের উপর দাঁড়াইয়া ; পাশ্চাত্য আমাদের উপর যে দাসত্বের লাঞ্ছন আঁকিয়া দিয়াছে তাহা তুলিয়া ফেলিতে হইবে, পাশ্চাত্য হইতে যদি কিছু আমাদের গ্রহণ করিতে হয় তবে ভারতের উপযোগী করিয়া তাহা লইব। আর আমাদের ধর্ম্ম কি খুঁজিয়া পাইলে, কেবল বাক্যে তাহা স্বীকার করিব না, পরন্তু মনে ও দেহে—আমাদের ব্যক্তিগত কর্ম্মায়তনে, আমাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠানে, আমাদের রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টায় তাহা জীবন্ত ও মূর্ত্তিমান করিয়া ধরিব।''

ভারতের কাজ, জগতের কাজ, ভগবানের কাজ করিবার জন্য যে যুবকমণ্ডলী আজ জাগিয়া উঠিয়াছে তাহাদিগকে এবং প্রত্যেককেই আমরা বলি, ''এই আদর্শ তোমরা ধারণও করিতে পারিবে না—তাহার সিদ্ধি ত দূরের কথা—যদি তোমাদের মনকে ইউরোপীয় ভাবের দাস করিয়া রাখ, যদি জীবনকে কেবল বাহিরের দৃষ্টি দিয়া দেখ। বাহিরের হিসাবে তোমরা কিছুই নও, কিন্তু অন্তরের অধ্যাত্মের হিসাবে তোমরা সবই। এক ভারতবাসীই সব বিশ্বাস করিতে পারে, সব দুঃসাহস করিতে পারে, সব বলি দিয়া দিতে পারে। সুতরাং সকলের আগে, হও ভারত-

বাসী। তোমার পিতৃপুরুষের সম্পদ উদ্ধার কর। উদ্ধার কর আর্য্যের চিন্তা, আর্য্যের সাধনা, আর্য্যের স্বভাব, আর্য্যের জীবন-ধারা। উদ্ধার কর বেদান্ত, গীতা, যোগদীক্ষা। এ সকল শুধু মস্তিষ্ক দিয়া, ভাবাবেগ দিয়া ফিরিয়া পাইলে চলিবে না, জাগ্রত জীবনে উহাদিগকে ফলাইয়া ধরিতে হইবে। জীবন-ক্ষেত্রে ঐ সকল বস্তু মূর্ত্তিমান করিয়া তোল, তোমরা মহান, শক্তিমান, বীর, অজেয়, নির্ভীক হইয়া দাঁড়াইবে। জীবন বা মৃত্যু তোমাদিগকে কোন শঙ্কাই আনিয়া দিবে না। দঃসাধ্য, অসম্ভব—এ সব কথা তোমাদের ভাষায় আর স্থান পাইবে না। অন্তরাত্মায় যে শক্তি তাহাই অসীম অনন্ত -- বাহিরের সাম্রাজ্য যদি ফিরিয়া পাইতে চাও, তবে আগে অন্তরের স্বরাজ ফিরিয়া পাও ; মায়ের আসন এইখানে, শক্তিসঞ্চার করিবেন বলিয়াই তিনি পূজার অপেক্ষায় রহিয়াছেন। তাঁহাতে তোমাদের শ্রদ্ধা অটুট রহুক, তাঁহার সেবা তোমরা কর, তোমাদের ব্যক্তিগত ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা সব তাঁহার ইচ্ছার মধ্যে হারাইয়া ফেল, তোমাদের ব্যক্তিগত অহঙ্কার দেশের বৃহত্তর অহঙ্কারে, তোমাদের পৃথক পৃথক স্বার্থপরতা সব জগতের স্বার্থে ডুবাইয়া দাও। নিজের ভিতরে শক্তির উৎস উদ্ধার করিয়া আন-- তবে আর সব জিনিষই তোমরা অবলীলাক্রমে ফিরিয়া পাইবে— সামাজিক স্বাস্থ্য, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা, বিশ্ব-চিন্তার নায়কত্ব, ভূমণ্ডলের রাজচক্রবর্ত্তিত্ব।"

কৰ্ম্মযোগ

আমরা বলিয়াছি কর্ম্মযোগ হইতেছে জীবনে বেদান্ত ও যোগের প্রয়োগ। হিন্দু ধর্ম্মের সহিত যাঁহাদের সাক্ষাৎ পরিচয় নাই, তাঁহারা অনেকে আমাদেব এই কথায় সন্দেহ করিতে পারেন। যাঁহাবা 'করিতকর্ম্মা'' লোক তাঁহারা সাধারণতঃ বিবেচনা করেন যে বেদান্তকে জীবন-যাত্রার দিশারী করিয়া চলা আব আধ্যাত্মিক উপলব্ধির জন্য যোগের আশ্রয় গ্রহণ করা ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক জিনিষ ; কারণ, তাহাতে মানুষ কর্ম্মের পথ ভুলিয়া গিয়া পড়ে নিবাকার তত্ত্বের জগতে। অবশ্য তত্ত্বমাত্রকেই যাঁহারা ''মিস্টি-সিজম্'', আত্ম-প্রবঞ্চনা, শঠতা প্রভৃতি নাম দিয়া থাকেন, তাঁহাদের সহিত আমাদের কোন কথা নাই। তবে আবার দেখা যায় এমন লোকও আছেন যাঁহরা হিন্দুধর্ম্মের মহত্ত্বে আস্থাবান শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইলেও মনে মনে এই ধারণা পোষণ করেন যে আধ্যা-ত্মিক জীবন যাপন করিতে হইলে মানব জীবনের পূর্ণ কর্ম্মব্যাপার হইতে কিছু দূরে থাকিতেই হইবে। কিন্তু সত্যকথা এই যে, মানুষ মানুষের সাধারণ জীবনই যাপন করে—যোগশক্তির সহায়ে ও বেদান্তের বিধান বা ধর্ম্ম অনুসারে—তাহার মধ্যেই আধ্যা-ত্মিক জীবন পরিপূর্ণ প্রতিভায় বিকশিত হইয়া উঠে। ভিতরের জীবন ও বাহিরের জীবনে এই রকম একটা মিলন-সূত্রকে

ধরিয়াই মানব জাতি আপন দিব্য শক্তি, ভাগবত সত্তার মধ্যে পরিশেষে উঠিয়া দাঁড়াইতে পারিবে। বেদান্ত জীবন-যাত্রায় কোন অনুপ্রেরণা দিতেছে না, ব্যবহারিক কর্ত্তব্যের বিধান দিতেছে না, তাহা শুধু তত্ত্ববিচারে ও নৈষ্কর্ম্ম্যে পর্য্যবসিত—এরূপ মনে করা ভুল। বরং কর্ম্মজীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যে নীতি মানুষের অধিকারে আসিতে পাবে তাহার নির্দ্দোষ প্রতিষ্ঠা, তাহাব পূর্ণ সমর্থন পাই গীতা ও উপনিষদের শিক্ষায়। গীতার বিশেষ শিক্ষা ঠিক সেই-গুলিই যেগুলি দিতেছে জীবনযাত্রার বিধান, একটা ধর্ম্ম ; আর বেদান্ত-সাধনার চরম লক্ষ্য যত অতিলৌকিকই হউক না কেন, তাহার জন্য আয়োজন এই জীবনের মধ্যেই আগে দরকার—জীবনের ভিতর দিয়া চলিয়াই তবে মানুষকে অমৃতত্ব লাভ করিতে হইবে। অন্য মতটি আমাদের মধ্যে দেখা দেয় তখনই যখন কতকগুলি বিশেষ ভাব ও বিশেষ প্রেরণা দেশের ইতিহাসের বিশেষ একটা যুগে প্রবল ও বিপুল হইয়া উঠিয়াছিল। আমা-দের ধর্ম্মের শেষ লক্ষ্য জড়-প্রকৃতির বন্ধন হইতে মুক্তি, ব্যক্তিগত পুনর্জন্ম হইতে মুক্তি। এই সব-শেষের চূড়ান্ত শান্তি ও শুদ্ধি আমাদেব দেশের কয়েকজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষকে এমন প্রবল ভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল যে তাঁহারা জীবনের ক্ষেত্র হইতে, সকল প্রকার শারীরিক কার্য্যকলাপ হইতে, আপনাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়াছিলেন, তাঁহারা চাহিয়াছিলেন যত সহজে ও যত শীঘ্র লক্ষ্যে গিয়া পৌঁছান যায়। তুঙ্গ পর্ব্বত-শৃঙ্গেব মত তাঁহারা সাধারণ জীবনের সমতল ক্ষেত্রের উপর দাঁড়াইয়া সকলের দৃষ্টি

আকর্ষণ করিয়াছেন এবং তাঁহাদের এই বৈরাগ্যকেই হিন্দুর সর্ব্বোচ্চ ও শ্রেষ্ঠ আদর্শরূপে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ করিয়া গিয়াছেন। ঠিক এই হেতু, শ্রীকৃষ্ণ এত জোর দিয়া বলিয়া গিয়াছেন যে পূর্ণযোগী সিদ্ধ পুরুষকে জীবন হইতে কর্ম্ম হইতে অবসর লইলে চলিবে না—এ সকলের আর কোন প্রয়োজন না থাকিলেও, "লোক-সংগ্রহের" জন্য কর্ম্ম-জীবন তাঁহাদিগকে ধরিয়া থাকিতে হইবে। সাধারণ লোকে শ্রেষ্ঠদেরই অনুসরণ করিয়া চলে—শ্রেষ্ঠরা কর্ম্ম ত্যাগ করিযাছে দেখিয়া সাধারণও যদি স্ব-স্ব-ধর্ম্ম বিসর্জন দিযা বসে তবে সমাজে হয় বর্ণসঙ্করের বিশৃঙ্খলার আবির্ভাব। আদর্শ যোগীর শক্তি কেবল অন্তর্মুখী, স্তম্ভিত হইয়া থাকে না, তাহা জীবের কল্যাণে সর্ব্বদা নিযুক্ত—হয় তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া পৃথিবীর উপর প্রবাহিত হয ভাগবত শক্তির একটা বিপুল বন্যা, অথবা তিনি নিজেই নেতা হইয়া সম্মুখে দাঁড়ান, মানব জাতিকে কর্ম্মক্ষেত্রের সংগ্রামের ভিতর দিযা পথ দেখাইয়া লইয়া চলেন; কিন্তু এসব করিলেও কর্ম্ম তাঁহাকে বাঁধিয়া কখন রাখে না, আপন বিশেষ ব্যক্তিত্বকে ছাড়াইয়া তিনি সর্ব্বদাই প্রতিষ্ঠিত একটা বৃহত্তর সত্তায়।

তারপর 'বেদান্ত' কথাটি সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় একটা সঙ্কীর্ণ অর্থে। শঙ্করের সন্ন্যাস ও বৈরাগ্যপূর্ণ বুদ্ধি যে বিশেষ অদ্বৈতবাদ, যে নিজস্ব মায়াবাদ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, তাহাকেই আমরা সচরাচর বেদান্ত নাম দিয়া থাকি। কিন্তু বস্তুতঃ বেদান্তীর একমাত্র প্রামাণ্য শাস্ত্র হইতেছে উপনিষদ, শঙ্করের গ্রন্থ নয়,—

মূল, কিন্তু টিকা টিপ্পনী নয়। শঙ্করের ভাষ্য এক দিক দিয়া খুবই উঁচুদরের, খুবই যুগোপযোগী ছিল; কিন্তু তবুও তাহা হইতেছে উপনিষদের অনেক ব্যাখ্যার অনেক মীমাংসার একটা ব্যাখ্যা, একটি মীমাংসা মাত্র। অতীতে এই ব্যাখ্যা, সব মীমাংসাই দেশের মনের উপর গভীর প্রভাব রাখিয়া গিয়াছে; ভবিষ্যতে যে আরও সুষ্ঠু একটা মীমাংসা হইবে না, তাহাও কেহ বলিতে পারে না। এই ধরণের একটা মীমাংসাকেই রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের শিক্ষা গড়িয়া তুলিতেছিল—তাহা চাহিয়াছিল সারা জীবনকে, সকল কর্ম্মকে আপন অঙ্গীভূত করিয়া লইতে। যখন বুদ্ধের আবির্ভাব হইয়াছিল, যখন তাঁহার দর্শন ও সদাচারে আর্য্যেরা দীক্ষিত হইয়া উঠিতেছিল, সেই সময়ে ভারতে একবার যে ব্যাপার ঘটিয়াছিল, তদ্রূপ দ্রুত না হইলেও তদপেক্ষা বৃহত্তর ক্ষেত্রে বিপুলতর উদ্দেশ্য লইয়া ঠিক সেই রকমেরই একটি ব্যাপারের সূচনা আজ আবার সুরু হইয়াছে। সে-দিনের মতনই আজ এক মহাপুরুষ আসিয়াছিলেন—তাঁহাকে বিভূতিই বল আর অবতারই বল, নামে কিছু আসে যায় না; তিনি ছিলেন মানব আধারে ভগবানের পূর্ণ প্রকাশ, ভাগবত শক্তির বিপুল একটা প্রবাহ লইয়া তিনি মানুষের মধ্যে নামিয়া আসিয়াছিলেন, তাহাদের দৈনন্দিন জীবন ও কর্ম্ম পূর্ণ আধ্যাত্মিকতার শক্তি ও প্রেরণায় ভরিয়া দিয়াছিলেন। তবে সেবার ছিল অংশ—হয়ত উত্তম অংশ, তবুও অংশ মাত্র; এবার কিন্তু পূর্ণ জ্যোতি। বৌদ্ধ ধর্ম্ম বেদান্তের ব্যবহার শিক্ষা

দিয়াছিল বটে কিন্তু বেদান্তের যে মূল সত্যটি তাহা সে অস্বীকার করিয়াছে—তাই যে দেশে তাহার জন্ম, যে দেশ ছিল তাহার রাজ-পাট ঠিক সেখান হইতেই শেষে তাহাকে বিতাড়িত হইতে হইল। বাহ্য ফলের দিক দিয়া দেখিলে, তখনও যাহা ঘটিয়াছিল এখনও তাহাই ঘটিবে—একটা বিরাট রাজনীতিক, সামাজিক ও মানসিক বিপ্লবেব ফলে ভারত জগতের গুরু হইয়া দাঁড়াইবে, দেশে দেশে জ্ঞানের আলো বিতরণ করিবে, এমন সব ভাবের ও প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি করিবে যাহা যুগ যুগান্তর ধরিয়া জীবন্ত শক্তি লইয়া বর্ত্তিয়া থাকিবে। ইতিমধ্যেই ত দেখিতেছি বেদান্ত ও যোগের শিক্ষা এসিয়ার সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছে, ইউরোপ ও আমেরিকার ব্যবহারিক জীবন ও কর্ম্মের ধারা পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তন করিতে সুরু করিয়াছে। পাশ্চাত্যের মনে প্রাচ্যের এই প্রভাব অনেক দিন ধরিয়াই নানা গৌণ উপায়ে বিন্দু বিন্দু করিয়া প্রবেশ লাভ করিয়াছে—কিন্তু সে সব যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধারা, মাটির নীচে গুপ্ত স্রোত; জগৎ অপেক্ষা কবিতেছে কবে ভারত মন্দাকিনীর পূর্ণ বন্যা মাথায় করিয়া আসিবে, বিশ্বমানবকে যাহাতে অবগাহন করাইয়া শুদ্ধ করিয়া তুলিবে।

যোগ হইতেছে ভগবানের সহিত সংযোগ; তাহার উদ্দেশ্য জ্ঞান, ভক্তি বা কর্ম্ম। মানুষের অন্তরে ও বাহিরে রহিয়াছে যে সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান সত্তা, তাহার সহিত যোগী সাক্ষাৎ সম্বন্ধ স্থাপন করিতেছেন। অনন্তের সহিত তিনি এক সুরে বাঁধা, তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া কোথাও তাঁহার শান্ত কল্যাণেচ্ছার ভিতর

দিয়া, কোথাও বা তাঁহার জাগ্রত কল্যাণ-কর্ম্মের ভিতর দিয়া ভাগবত শক্তি পৃথিবীর উপর আপনাকে ঢালিয়া দেয়। মানুষ যখন অহংকারের খোলসটি ফেলিয়া দিয়া উপরে উঠে, পরের জন্য জীবন ধারণ করে, পরের সুখে দুঃখে নিজের সুখ দুঃখ অনুভব করে; যখন সে ভক্তিভরে, নিষ্ঠা সহকারে, নির্দ্দোষভাবে কর্ম্ম করে, অথচ ফলের জন্য ভাবনা-চিন্তা বিসর্জন দেয়, জয়ের আশায় উদ্‌গ্রীব হয় না, কি পরাজয়ের আশঙ্কায় শঙ্কিত হয় না; যখন সে যাহা কিছু কর্ম্ম সকলই ভগবানের জন্য করে, প্রত্যেক চিন্তা প্রত্যেক বাক্য প্রত্যেক কার্য্য ভাগবত পদমূলে নিবেদন করে; যখন সে দ্বেষ ও ভয়, আসক্তি ও বিরক্তি হইতে মুক্ত হইয়া প্রাকৃতিক শক্তির মতনই অচঞ্চল অশ্রান্ত অবাধ ও অব্যর্থভাবে কাজ করিয়া চলে; যখন সে নিজেকে শরীরের বা প্রাণের বা মনের বা এই তিনের সমষ্টির সহিত এক করিয়া ভাবে না, দেখিতে পায় নিজের সত্যকার নিজত্ব; যখন সে নিজের অমৃতত্ব ও মৃত্যুর অসত্যতা উপলব্ধি করে; যখন সে অনুভব করে, জ্ঞান নামিয়া আসিতেছে, নিজে যন্ত্রমাত্র, তাহার মন, তাহার বাক্য, তাহার ইন্দ্রিয়গ্রাম, তাহার সকল অঙ্গের ভিতর দিয়া ভাগবত শক্তি অবাধে কাজ করিয়া চলিয়াছে; এই ভাবে মানুষ যখন তাহার যাহা কিছু আছে, সে যাহা কিছু করে এবং নিজের যাহা কিছু সমস্তই—সকলের প্রভু, মানবজাতির সখা ও সহায় যিনি তাঁহাকে অর্পণ করিয়া তাঁহারই মধ্যে নিত্যবাস করে, এবং ঃখ দশ্চিন্তা চাঞ্চল্য হইতে মুক্তিলাভ করে,—তখনই তাহার নাম

যোগ। আসন-প্রাণায়াম, ধ্যান-ধারণা, পূজা-আচার নিজেরা কিছু যোগ নয়, যোগের উপায় মাত্র। আবার যোগ যে একটা কঠিন বা বিপজ্জনক পথ, তাহাও নয়; অন্তরের দিশারী ও গুরু যিনি তাঁহার শরণ লওয়া সকলেরই পক্ষে সুসাধ্য ও মঙ্গলকর। এ বস্তুতে অধিকার সকল মানুষেরই আছে। কারণ এমন মানুষ কেহ নাই যাহার প্রকৃতিতে শক্তি শ্রদ্ধা বা ভক্তি ব্যক্তভাবে না হউক, অন্ততঃ গুপ্তভাবে না রহিয়াছে—এই তিনটি বৃত্তির শুধু একটিমাত্রও যোগের অধিকারী হইবার পক্ষে যথেষ্ট। সকলে অবশ্য এক জীবনের মধ্যেই এই পথের চরমে পৌঁছিতে পারে না, কিন্তু কিছু না কিছু দূর সকলেই অগ্রসর হইতে পারে। আর যে পরিমাণে মানুষ অগ্রসর হয় সেই পবিমাণেই সে শান্তি শক্তি আনন্দ লাভ করে। এমন কি, এই ধর্ম্মের সামান্য একটু-খানিও একটা মানুষকে একটা জাতিকে মহৎভীতি হইতে ত্রাণ করে—

স্বল্পমপস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।

আমরা আবার বলি, জীবনীধারা হইতে আধ্যাত্মিকতাকে একটা বিচ্ছিন্ন পৃথক বস্তু মনে করা ভুল। ঈশ উপনিষদের কথা, "সব ত্যাগ কর, তবে সবই ভোগ করিতে পারিবে, অন্য কাহারও বিত্তে লোভও আবার করিও না। জগতে তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়াই তুমি তোমার শতবর্ষের জীবন যাপন করিতে বাঞ্ছা করিবে; তোমার কর্ম্মের বন্ধন হইতে মুক্তিলাভের আর কোন উপায়ই তোমার নাই।" এই জগতের যত সংঘর্ষ তাহাকে

কর্ম্মযোগীর আদর্শ

অতিক্রম করিয়া ঊর্দ্ধে রহিয়াছে ধর্ম্মের চূড়া—এ রকম মনে করা মহা ভুল। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বার বার ডাকিয়া বলিয়াছেন, এই সংঘর্ষে লিপ্ত হইবার জন্য। "যুদ্ধ কর, শত্রুর ধ্বংসসাধন কর!" "আমাকে স্মরণে রাখ আর যুদ্ধ কর!" "তোমার সকল কর্ম্ম আমাকে নিবেদন কর, হৃদয় আধ্যাত্মিক ভাবে পূর্ণ করিয়া, সকল আকাঙ্ক্ষা হইতে, সকল অহংকার হইতে মুক্ত হইয়া কর যুদ্ধ! অন্তর হইতে তোমার জ্বরের আবেশ দূর হউক।" আমরা মনে করি যে ধার্ম্মিক মানুষ যদিই বা সাধারণ কাজকর্ম্ম পরিত্যাগ না করেন, তবুও তিনি এমন সাত্ত্বিক, সাধু, দয়ালু, নরম প্রকৃতির হইয়া পড়েন যে সংসারের রূঢ় কর্ম্ম সব তাঁহার দ্বারা সম্ভব হয় না। কিন্তু এ ধারণাও ভুল। ইহার চূড়ান্ত বিপরীত কথা গীতা বলিয়া গিয়াছেন, তাহার মধ্যে কোন সন্দেহ কোন দ্বিধার অবকাশ পর্য্যন্ত দেওয়া হয় নাই—"যাহাব প্রকৃতি হইতে অহংকার ধুইয়া মুছিয়া গিয়াছে, নিজের অন্তরাত্মার উপরে যে কর্ম্মের কোন ছায়া পড়িতে দেয় না, সমস্ত জগৎকে সে যদি হত্যা করে, তবুও সে হত্যাকারী নয়, তবুও সে মুক্ত।" ধ্বংসক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রের উপর দিয়া পার্থসারথী রথ চালাইয়া দিয়াছেন—কর্ম্মযোগের ইহা জ্বলন্ত আলেখ্য। শরীর হইতেছে রথ, ইন্দ্রিয় সকল হইতেছে ধাবমান অশ্ব, আর জাগতিক কর্ম্মধারার রক্তাক্ত কর্দ্দমাক্ত পথ বাহিয়া বৈকুণ্ঠে লইয়া চলিয়াছেন মানুষের অন্তরাত্মাকে শ্রীকৃষ্ণ।

উভয়তঃ

মানবজাতির জীবনধারায় দুইটি গতি, এক উৰ্দ্ধমুখী, আর এক অধোমুখী—এবং দুইটিই অদম্য অবার্য্য। ভগবান, স্বয়ং নিয়তি যে সাধনার প্রতি বিমুখ হইয়াছেন, তাহার অধোগতি এক স্থানে কিছু সময়ের জন্য স্থগিত হইতে পারে, এমন কি তাহাতে একটা ক্ষণিক উৰ্দ্ধগতি দেখিয়া সেই পথের পথিক আশায় উৎফুল্লও হইয়া উঠিতে পারে; আবার যখন একটা ধর্ম্ম বা আদর্শ বা একটা জাতি সবেগে সগর্ব্বে উঠিয়া চলিয়াছে, তখন শুধু পশুবলে তাহাকে নিমেষের জন্য পিছন দিকে টানিয়া রাখা যাইতে পারে, অসীম পরিশ্রমে তাহার গতি-চক্রকে পশ্চাৎ দিকে দুই এক অঙ্গুলি পরিমাণ ঘুরাইয়া দিলেও দেওয়া যাইতে পারে—কিন্তু ভগবানের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করা যায় না, জবরদস্তি করিয়া ভগবানকে দখল করা যায় না। যেখানে তিনি স্বয়ং সারথী, জয় সেখানে অনিবার্য্য—যদি তাঁহার রথচক্র কোথাও পিছনে হটিয়া আসে, তার অর্থ প্রতিকূল ভূমি হইতে ঘুরিয়া তিনি দাঁড়াইতে চাহিতেছেন অনুকূল ভূমির উপর। কখন বা তাঁহার অধিকৃত ভূমি হইতে তাঁহাকে তাড়াইতে শত্রুপক্ষকে তিনি নিজে বাধ্য করান, কারণ, সে স্থান পাকাপাকি অধিকার করিয়া রাখা তাঁহার উদ্দেশ্য নয়, অবান্তর ক্ষেত্রে পিছনে

হটিয়া তিনি শত্রুর বলক্ষয় করিতে চাহেন,—যে জয়ে তাহারা উৎফুল্ল হইয়া উঠে, তাহাই হয় তাহাদের চরম পরাজয়ের কারণ।

কেবল খুঁটিনাটির উপর যাহাদের দৃষ্টি, তাহারা আঙ্গুল দেখাইয়া বলে, "এই যে এইখানে আমাদের হার হইয়াছে, আর ঐখানে আমাদের জিত" : আর পরাজয়ের তালিকা যদি জয়ের তালিকা হইতে দীর্ঘ হইয়া পড়ে, তবে হতাশে তাহারা হাল ছাড়িয়া দেয়। এই জন্যেই কর্ম্মের গতি মানুষ বুঝিতে পারে না—চোখ খুলিয়া তাহারা দেখিতে চায় না ছোট ছোট ঢেউ, ছোট ছোট পিছন-টান সব সত্ত্বেও তাহার বৃহৎ ধারা অব্যর্থভাবে চলিয়াছে কোন দিকে। তা'ছাড়া, সাময়িক পরাজয় যেখানে অবশ্যম্ভাবী, সেখানেও শ্রদ্ধার অভাবই সেই পরাজয়কে ডাকিয়া আনে। শ্রদ্ধার দৃষ্টি আর জ্ঞানের দৃষ্টি অবশ্য ঠিক এক বস্তু নয়। শ্রদ্ধা যেখানে মোটামুটিভাবে উপলব্ধি করে, জ্ঞান যেখানে স্পষ্টভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রত্যক্ষ করে—তবুও মোটের উপরে শ্রদ্ধা ও জ্ঞানকে একই বলা যাইতে পারে, ভক্তের জ্ঞানকে দ্রষ্টার জ্ঞান সমর্থন করে, প্রমাণিত করে। জ্ঞান যতক্ষণ কর্ম্মসিদ্ধির অপেক্ষায় বসিয়া থাকে, ততক্ষণ শ্রদ্ধাই ভগবানের জন্য যুদ্ধ করিয়া চলে ; জ্ঞান যতক্ষণ আসে নাই, শ্রদ্ধাই ততক্ষণ একমাত্র আশ্রয়। দিব্যদৃষ্টির জ্ঞান চাই, আর নতুবা চাই অদম্য শ্রদ্ধা—এই দুইটির একটিও না থাকিলে কোন মহৎ সাধনাই সিদ্ধ হয় না।

সুতরাং বস্তুরাজির মধ্যে রহিয়াছে যে বৃহৎ প্রেরণার ধারা আমরা যেন তাহাকেই দেখি, আর তাহারই আলোকে বুঝিতে

চেষ্টা করি সাময়িক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা সব। ঘটনাচক্রের মূল আবেগ চলিয়াছে কোন দিকে—ঊর্দ্ধ দিকে না অধোদিকে? যদি অধোদিকেই হয়, তবুও আমাদিগকে চেষ্টাই করিতে হইবে; কারণ, ধর্ম্মপক্ষের পরাজয় নিশ্চিন্ত বলিয়া তাহা হইতে যে সরিয়া দাঁড়ায় সে অতি হেয় জীব—মানবজাতির সে ঘোর অনিষ্টই করে। যে সব মহৎ সাধনায় মানুষ দুর্জয় পরাক্রমে শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়া চলে, মানুষের বীর্য্য ও আত্মদানেই তাহারা সত্য ও সুন্দর হইয়া উঠে, পরিণামে তাহাদেরই বিজয় অনিবার্য্য। আর যেসব কাজ কাপুরুষের দ্বারা সমর্থিত—তেমনি অবহেলায় পরিত্যক্ত হয়, তাহাদেরই কোন ভবিষ্যৎ নাই। মধ্যযুগে ফরাসীদেশে ও ইতালীতে যে জনসাধারণের স্বাধীনতা-প্রয়াস দেখা দিয়াছিল, তখন তাহা ব্যর্থ হইয়া যায়, তৎপরিবর্ত্তে টিউটনের দেশ হইতে আসিল আভিজাত্যের স্বেচ্ছাচার। কিন্তু সেই একই আন্দোলন আবার যখন মাথা তুলিল তখন পূর্ব্বাপেক্ষা সে শতগুণ শক্তি লইয়া ফরাসী বিপ্লবকে সৃষ্টি করিল। যেসব জীবাত্মা শত শত বৎসর পূর্ব্বে যুদ্ধ করিয়া প্রাণ দিয়াছিল, তাহারাই যেন বীরবিক্রমে পৃথিবীতে আবার নামিয়া আসিল, বিজয়ী (ফিউডল) আভিজাত্য-তন্ত্রকে শতখণ্ডে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিল। কিন্তু আমরা জানি, আমাদের যে সাধনা তাহার এখন ঊর্দ্ধগতি; সুতরাং আমরা নিঃসঙ্কোচে তাহা আশ্রয় করিয়া চলিতে পারি, সামান্য খুঁটি-নাটিতে যদি কোথাও পরাজয়ই হয়, তবুও এ কথা নিশ্চয় যে সে পরাজয় জয়েরই পথ পরিষ্কার করিয়া আনিতেছে।

কর্ম্মযোগীর আদর্শ

আদর্শ ধরিয়া আমরা চলিবই, কিন্তু তার অর্থ এমন নয়, যে-উপায়-বিশেষ কার্য্যতঃ বিফলতা আনিয়া দিয়াছে, অথবা সাময়িকভাবে সফল হইলেও ভগবান তাঁহার অনুমতি যাহা হইতে সরাইয়া লইয়াছেন সে উপায়ও ধরিয়া চলিতে হইবে। আমাদের স্মরণে রাখা উচিত, আধুনিক রাষ্ট্র-ক্ষেত্রের যে-সব বৃহৎ গতিধারা জাতিহিসাবে আমরা সে-সব লইয়া নাড়াচাড়া করিতে এখনও সুদক্ষ হইয়া উঠি নাই। আমাদের মধ্যে যাহারা সৈন্যসামন্ত শুধু তাহাদেরই নয়, আমাদের সেনাপতি, আমাদের মন্ত্রপতিদেরও পাকা হইয়া উঠিতে হইলে ঘটনাচক্রের সহিত ঘনিষ্ঠতর পরিচয়ে আরও শিক্ষালাভ দরকার, তাঁহাদের প্রয়োজন অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান। উৎসাহ, উদ্দীপনা, আত্মদান, বুদ্ধির সামর্থ্য, প্রাখর্য্য, উদ্ভাবনী শক্তি, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব এ সবই প্রচুর পরিমাণে আমরা পাইয়াছি। কিন্তু আমদের মধ্যে এখনও যাহা অপরিপক্ক অপরিণত তাহা হইতেছে—সেই পূর্ণ অভিজ্ঞতা যাহা অনেক যুদ্ধের ফলে বর্ষীয়ান যোদ্ধার অধিগত হইয়াছে, সেই সূক্ষ্ম রাজনীতিক বুদ্ধি যাহা অনেকদিন ধরিয়া বড় বড় রাজকর্ম্ম দেশবিদেশের ভাগ্য লইয়া নাড়াচাড়া করিতে করিতে তবে আয়ত্তাধীন হয়। কিন্তু আমাদের নেতা ও গুরু ভগবান স্বয়ং ; যে-দেশকে তিনি বরণ করিয়া লইয়াছেন তাহাকে তিনি নিজেই নির্দ্দোষ শিক্ষায়, পূর্ণ সামর্থ্যে প্রস্তুত করিয়া তুলিবেন। শুধু আমাদের দিক হইতে প্রয়োজন, ভুল স্বীকার করা, পথ পরিবর্ত্তন করা, শিক্ষালাভ করা। তাহা হইলেই সকল

বাধা অতিক্রম করিয়া অব্যর্থ অবিচলিত গতিতে, বিপুল বেগে লক্ষ্যের দিকে চলিতে পারিব।

তারপর, আমাদের মধ্যে এখনও অনেক দোষ ছড়াইয়া আছে, সেগুলির সংশোধন আমরা করি নাই। সুতরাং সর্ব্ব-প্রথম কাজ হইতেছে নির্ম্মমভাবে এগুলির উপর অস্ত্র প্রয়োগ করা। মানসিক উপকরণ সব যথেষ্ট পরিমাণে আমাদের ত নাই, কিন্তু আধ্যাত্মিক উপকরণও আমাদের নিখুঁৎ নয়। আমাদেব নেতাদের, আমাদের নীতদের, দুইএরই একটা গভীরতর সাধনা দরকার,—আমাদের যজ্ঞে আসল গুরু যিনি, দিশারী যিনি, সেই ভগবানের সহিত আরও সাক্ষাৎ সম্বন্ধ স্থাপন কবিতে হইবে, অন্তরকে একটা উর্দ্ধতর চেতনায় তুলিয়া ধরিতে হইবে, আমাদের চিন্তার ও কর্ম্মের পিছনে আরও প্রবল প্রখর শক্তি জাগাইতে হইবে। পদে পদে ঠেকিয়া কি আমরা শিখি নাই, ইউরোপের মত একটা আস্তিক্যবুদ্ধিশূন্য প্রাকৃত প্রাণের উন্মাদ উত্তেজনা ধরিয়া চলিলে আমাদের জয় হইবে না? আমরা ভারতসন্তান—আমাদিগকে মুক্তি দিবে, মহৎ করিবে ভারতের অধ্যাত্ম প্রতিভা, ভারতের সাধনা, "তপস্যা", "জ্ঞান", "শক্তি"। ভারতের "তপস্যা" ইউরোপের discipline হইতে অনেক বড় জিনিষ। যে ভাগবত শক্তিতে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় ঘটিতেছে তাহাকে আধ্যাত্মিক সাধনায় আমাদের নিজেদের মধ্যে মূর্ত্ত ও বাস্তব করিয়া তোলাই হইতেছে তপস্যা। ইউরোপের philosophy হইতে আমাদের "জ্ঞান" অনেক বড়। প্রাচীনেরা যাহাকে

বলিতেন দৃষ্টি, আধ্যাত্মিক চক্ষে প্রত্যক্ষ করা, তাহারই ফলে যে সাক্ষাৎ জ্ঞান তাহাই জ্ঞান। আর শক্তি অর্থও ইউরোপের strength নয়—যে-বিশ্বশক্তি গ্রহ-নক্ষত্র চালাইয়া লইয়াছে তাহা যখন একটা নাম ও রূপ গ্রহণ করিয়া ব্যষ্টিভাবে দেখা দিয়াছে তখনই তাহাকে বলি "শক্তি"। ভারত উঠিতেছে, কিন্তু ভারতের ভিতর দিয়া প্রাচ্যের জয় হইবে। তাই রাষ্ট্রীয় নেতার পশ্চাতে দাঁড়াইবে, বা তাঁহারই মধ্যে আবির্ভূত হইবে সিদ্ধযোগী। একই আধারে শিবাজীর সহিত রামদাসকেও জন্ম লইতে হইবে, কাভূরের সহিত ম্যাট্‌সিনীকে মিশিয়া যাইতে হইবে। আত্মা হইতে বিচ্ছিন্ন বুদ্ধি, শুদ্ধি হইতে বিচ্ছিন্ন বল ইউরোপীয় বিপ্লবের সহায় হইতে পারে—কিন্তু ইউরোপের বলে চলিলে আমাদের জয় হইবে না।

গত শতাব্দীর সকল প্রচেষ্টা আমাদের বিফলে গিয়াছে, কারণ আমরা কেবল বুদ্ধিবৃত্তিকে আশ্রয় করিয়া চলিয়াছিলাম, তাহার পিছনে প্রবুদ্ধ হৃদয়েব প্রেরণা ছিল না। বর্ত্তমান যুগের স্বদেশ-সাধনা এই অভাব পূরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছে, হৃদয়ের অনুপ্রেরণায় মস্তিষ্কের শক্তিকেও তীব্রতর তীক্ষ্ণতর করিয়া ধরিয়াছে। কিন্তু আমাদের স্বদেশ-সাধনার মধ্যেও ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে। ভাবের দিক দিয়া, আবেগের দিক দিয়া আমরা স্বদেশী হইতে পারিয়াছি বটে, কিন্তু কর্ম্মের বাস্তবের হিসাবে আমর বিদেশীই রহিয়া গিয়াছি। যে-বুদ্ধির সহায়ে আমরা দেশের সেবা করয়াছি, তাহা নিজেরই মধ্যে নিজে

সম্পূর্ণ বলিয়া সীমাবদ্ধ ; তাহাতে স্বচ্ছতা আছে, যাথার্থ্য আছে, নৈপুণ্যও আছে—কিন্তু দিব্যদৃষ্টির দ্বারা অনুপ্রাণিত যে অব্যর্থ জ্ঞান তাহা আমাদের দেশ-সাধনাকে সম্যক পরিচালিত করে নাই। আমরা ভাবুক, কল্পনাপ্রিয়, আদর্শপন্থী হইতে পারিয়াছি, কিন্তু গভীরতর সত্যকে খুঁজিয়া বাহির করিতে, ভগবানেরই ইচ্ছাকে চিনিয়া লইতে যে-শিক্ষা দরকার তাহা আমাদের হয় নাই। আমরা বিপুল ভাবাবেগ ধরিয়া চলিয়াছি, কিন্তু সকল রকম হৃদয়োচ্ছ্বাস হইতে মহত্তর ও খরতর যে নির্ম্মল তপোবল, যে চক্ষুষ্মান আত্মস্থ শক্তি তাহার সন্ধান তেমন পাই নাই। আমাদের স্বদেশ-সাধনাকে হয় শুদ্ধ হইয়া উঠিতে হইবে, একটা নিবিড়তর সত্য আবিষ্কার করিয়া আরও উচ্চতর দিব্য-প্রেরণায় চলিতে হইবে ; আর না হয়, পুরাতন দেহ সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়া নূতন দেহ ধরিতে হইবে। ঘটনাচক্রের ধারা দেখিয়া মনে হয়, শেষোক্ত পথেই যেন সে চলিতেছে। কিন্তু দুইএর যে পথেই চলি না কেন, পরিণামে জয় অবশ্যম্ভাবী।

সকল ঘটনার মধ্য দিয়াই কিছু দিন হইল আমরা যেন শুনিতেছি অন্তরের শ্রীগুরু আমাদিগকে ডাকিয়া বলিতেছেন, "আগে ত্যাগ কর, তবে সঞ্চয় করিতে পারিবে ; আমার ইচ্ছানুসারে কাজ কর, নিজেকে জান, শুদ্ধ হও, খেয়ালের পিছনে ছুটিও না।" যাহার শুনিবার ক্ষমতা আছে, সেই যেন কান পাতিয়া শোনে। নিজের সহিত নিজের আদান-প্রদান ছাড়া, নিজের ভিতরের আলোক ছাড়া জ্ঞান আসিবে না—এমন কি,

বাহিরের কাজে সফলতার জন্য দরকার যে পথ-নির্দ্দেশের জ্ঞান, সে জ্ঞানও নয়। এই শিক্ষাটুকু আমাদের যতদিন না হইবে ততদিন নীচের অল্পজ্ঞানের আলোকে যে-পথেই যতটুকুই চলি না কেন, তাহা ব্যর্থ হইবেই।

দক্ষিণেশ্বরে যে কাজ সুরু হইয়াছিল তাহা শেষ হওয়া ত দূরের কথা, লোকে তাহার মর্ম্ম এখনও গ্রহণ করিতে পারে নাই। বিবেকানন্দ যাহা পাইয়াছিলেন, যাহা বিকশিত করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন, সে-জিনিস এখনও ত বাস্তবে মূর্ত্তি লয় নাই। ভবিষ্যতের যে সত্য বিজয় গোস্বামী নিজের মধ্যে লকাইয়া রাখিয়াছিলেন তাহাও তাঁহার শিষ্যদের কাছে নিঃশেষ ব্যক্ত হইয়া যায় নাই। যে দিব্য-জ্ঞান দেখা দিতে চলিয়াছে তাহা কিন্তু তেমন গোপন নয়, যে-শক্তির আবির্ভাব হইতেছে তাহা আরও বাস্তব, আরও শরীরী—কিন্তু সে-বস্তু কোথায় আসিবে, কবে আসিবে—কে বলিতে পারে?

ভারতের অন্তর-পুরুষের জাগরণ

দেশের যে-জাগরণ কেবল একটিমাত্র ক্ষেত্রে আবদ্ধ, তাহা কখন সত্যকার প্রাণের জাগরণ হইতে পারে না, তাহা কখন স্থায়ী হয় না। দেশ সত্য সত্যই জীবন্ত হয় যখন তাহার অন্তর-পুরুষ জাগে, আর জীবন তখন একটি ধারায় নয়, কিন্তু যত প্রকার কর্ম্মচেষ্টাকে ধরিয়া মানুষ আপন অন্তরের ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু পুরুষের শক্তি ও আনন্দ ব্যক্ত করিতে পারে, সে সকলেরই মধ্যে বিকশিত হইয়া চলে। সৃষ্টি আছে, আনন্দের জন্য; এই আনন্দের জন্যই পরম-পুরুষ জীবনের বিপুল লীলার মধ্যে নামিয়া আসিয়াছেন; তাঁহার এই আনন্দ নিজেকে বহুরূপে প্রকাশ করিয়া ধরিবারই আনন্দ। এই জন্যই কোন দুইটি ব্যক্তি এক রকমের নয়, কোন দুইটি দেশও এক রকমের নয়। ব্যষ্টি হউক গোষ্ঠি হউক, সাধারণ মানুষভাব ছাড়া প্রত্যেকের আছে নিজের নিজের পৃথক প্রকৃতি। শুধু মানবজাতি হিসাবে বৃত্তিকে চরিতার্থ করিতে দেশ চাহে না, দেশ তাহার নিজস্ব, অন্যান্য দেশ হইতে পৃথক যে স্বভাব ও সামর্থ্য তাহারও সার্থকতা দাবী করে। এই বিশেষ সার্থকতা যদি সে না পায়, তবে দেশের ধ্বংস অনিবার্য্য। সুতরাং, দেশের কোন কর্ম্মপ্রচেষ্টা জীবন্ত কি না, তাহা দুই রকমে পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইতে পারে। প্রথমত, যদি সে-চেষ্টা

হয় পরের অনুকরণ, বিদেশ হইতে ধার-করা কৃত্রিম জিনিষ, তবে সাময়িক যতখানি সফলতাই তাহাতে হউক না কেন, বুঝিতে হইবে দেশ আত্মহত্যা করিতে বসিয়াছে, চলিয়াছে অনিবার্য্য মৃত্যুর দিকে; প্রাচীন ইউরোপে এই রকমে অনেক জাতি লোপ পাইয়া গিয়াছিল, যখন তাহারা নিজের নিজের বিশেষ সত্তাটি বলি দিয়া, চাহিয়াছিল রোমকের শিক্ষা-দীক্ষা, রোম-কের শান্তি, রোমকের সমৃদ্ধি। পক্ষান্তরে, যখন একটা জাতি নিজস্ব বৈশিষ্ট্যকে তাহার প্রত্যেক অঙ্গভঙ্গীতে ফুটাইয়া তোলে, যখন তাহার নব নব কর্ম্মচেষ্টা চায় নিজের অন্তর-পুরুষকেই ব্যক্ত করিতে—তখন বুঝিতে হইবে দেশ জাগিতেছে, বাঁচিয়া ও বাড়িয়া উঠিতেছে;—তখন তাহার রাষ্ট্রে, সমাজে, চিন্তার জগতে, বাহিরের প্রতিষ্ঠানে যতকিছু পরিবর্ত্তন বা বিপ্লবই ঘটুক না কেন, সে-জাতির ভবিষ্যৎ মহত্ত্ব সম্বন্ধে কোন সন্দেহ করিবার নাই। উনবিংশ শতকে ভারত ছিল অনুচীকির্ষু, আত্মহারা, কৃত্রিম; তখন সে চাহিয়াছিল কি রকমে ইউরোপকে হুবহু ভারতে আনিয়া প্রতিষ্ঠা করা যায়; ভারত তাহার গীতার সে গভীর উপদেশ ভুলিয়া গিয়াছিল- –"পরের ধর্ম্ম সুন্দরভাবে অনুসরণ করা অপেক্ষা, নিজের ধর্ম্ম খারাপভাবে অনুসরণ করিয়া থাকাও ভাল; নিজের ধর্ম্মে থাকিয়া মৃত্যুও শ্রেয়, কিন্তু পরের ধর্ম্ম ভযাবহ।" কারণ, নিজের ধর্ম্মে মৃত্যুর ফলে হয় নূতন জন্ম, কিন্তু পরের ধর্ম্মে সাফল্য অর্থ আত্মহত্যায় সাফল্য। ইউরোপীয় হইয়া যাইবার চেষ্টা আমাদের যদি সফল হইত, তবে আমরা

চিরদিনের মত আমাদের আধ্যাত্মিক সামর্থ্য, আমাদের বুদ্ধি-শক্তি, আমাদের দেশের আছে যে নব নব রূপে আপনাকে সহজেই পরিবর্ত্তিত করিয়া লইবার ও নবজীবনে বার বার সঞ্জীবিত হইয়া উঠিবার একটা স্বাভাবিক ক্ষমতা, তাহা হারাইয়া বসিতাম। ইতিহাসে একাধিকবার এই ধরণের শোচনীয় ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে—আর একটি, আরও চূড়ান্ত শোচনীয় ঘটনা সেই তালিকার অন্তর্ভুক্ত হইত শুধু। দেশের সমস্ত কর্ম্মচেষ্টা যদি কেবল অনুকরণে, বিদেশীর পদাঙ্কানুসরণেই পর্য্যবসিত হইত, তবে এই ধরণের পরিণাম অবশ্যম্ভাবীই ছিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু সুখের বিষয়, দেশের প্রাণবায়ু যতটুকুই হউক বহিতেছিল—বাংলার ও পঞ্চনদের ধর্ম্ম-প্রচেষ্টার মধ্যে, মহারাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয়-আকাঙক্ষার মধ্যে, বাঙ্গালীর সাহিত্য-সাধনার মধ্যে। কিন্তু এখানেও দেশের জীবন ফল্গুধারার মত তলে তলেই প্রবাহিত ছিল; ভারতের যে নিজস্ব প্রকৃতি, যে-প্রাণশক্তি তাহা বিদেশী নামের ও রূপের ভার কাঁধে করিয়া ধুঁকিতেছিল—যে-দিন হইতে এই দুই বিরোধী ভাবের মধ্যে দেশেরই ধর্ম্মটি স্পষ্টভাবে বড় হইয়া উঠিল, সেই দিন হইতেই ভারতের মুক্তি সন্দেহের অতীত। গোঁড়া হিন্দুয়ানী এক দিকে অবশ্য ছিল তামসিক, নিশ্চল, জ্ঞানহীন, অক্ষম—কিন্তু আর এক দিক দিয়া দেখিলে দেখি এই গোঁড়া হিন্দুয়ানীই দেশকে বাঁচাইয়াছিল, দেশ যে ধ্বংসের পথে আরও তাড়াতাড়ি ছুটিয়া চলে নাই, পচিয়া গলিয়া একেবারেই শেষ হইয়া যায় নাই, তাহার কারণ ঐ গোঁড়া হিন্দুয়ানী; ইহারই কল্যাণে,

কর্ম্মযোগীর আদর্শ

দেশের চিরঞ্জীবী অন্তরাত্মা আপনাকে উপলব্ধি করিবার, আপনাকে প্রকাশ করিবার জন্য প্রয়োজনীয় সময় ও অবকাশ পাইয়াছিল। ভারতের অন্তর-পুরুষের জাগরণ, প্রথম বিজয়, ধর্ম্মে। অনেক রকম লক্ষণ বরাবরই দেখা যাইতেছিল, অনেক মহাপুরুষই আসিয়া বীজ বপন করিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু যে-দিন একজন নিরক্ষর সন্ন্যাসীর কাছে, বিদেশের কোন রকম ভাব বা শিক্ষা যাঁহাকে এতটুকু স্পর্শ করিতে পারে নাই এমন একজন স্বয়ং-সিদ্ধ পাগল ভগবৎ-প্রেমিকের পদমূলে কলিকাতা নগরীর আধুনিক শিক্ষাদীক্ষায় শিক্ষিত-দীক্ষিত যুবকমণ্ডলীর মধ্যে শীর্ষস্থানীয় যাহারা তাহারাই আসিয়া মাথা নত করিল, সেই দিনই যুদ্ধের ফল স্থির হইয়া গেল। গুরু যে পুরুষসিংহকে দেখাইয়া বলিয়াছিলেন, একদিন সে সমস্ত পৃথিবীকে দুই হাতে লইয়া যথা-ইচছা খেলা কারিবে, সেই বীর বিবেকানন্দের অভিযান জগতের কাছে এই কথার প্রথম চাক্ষুষ প্রমাণ লইয়া আসিল যে ভারত জাগিয়াছে কেবল প্রাণধারণ করিবার জন্য নয়, কিন্তু দিগ্বিজয় করিবার জন্য। তারপরে, দেশ যখন সম্পূর্ণভাবে জাগিল, তখন তাহার একটি ধারার লক্ষ্য ও সাধনা হইল ইংরাজের আগমনের অব্যবহিত পূর্ব্বে ভারতের যে অবস্থা ছিল তাহাকে কল্পনার অঞ্জন দিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আবার আলিখিত করিয়া তোলা। কিন্তু ইহাকেও জড়তা বলা যায় না। আমাদের দর্শন পুষ্টির ও পরিবর্ত্তনের অনিচছাকেই "তমঃ" নাম দিয়াছে, আর তমোগুণের আধিক্য ক্রম-অবনতির ধ্বংসের দিকে লইয়া

চলে। তাই আত্মরক্ষার জন্য প্রয়োজন আক্রমণ; একটা শক্তি যখন তাহার অধিকারের পরিধি বিস্তৃত করিতে বিরত হইয়াছে, তখনই বুঝিতে হইবে তাহার জীবনেরও বিরাম হইয়াছে। একই স্থানে যে দাঁড়াইয়া থাকে, কেবল আত্মরক্ষা করিয়া চলে, "সন্ধ্যা"র ভাষায় নিজের "কোটে"র মধ্যে যে আশ্রয় গ্রহণ করে আর সেখান হইতে বাহির হইতে চায় না, তাহার পরাজয় নিশ্চিত—দিনে দিনে ক্ষয় পাইতে পাইতে অনতিবিলম্বে সে জীবন্ত জিনিষের জগৎ হইতে নিশ্চিহ্নভাবে লোপ পাইয়া যায়। হিন্দুধর্ম্ম চিরকালই ছিল সচল, বিজিগীষু; আক্রমণকারীকে সে আগাইয়া গিয়া আক্রমণ করিয়াছে, তাহার ছাউনী তাহার দুর্গ অধিকার করিয়াছে, তাহার ধন-দৌলত লুণ্ঠন করিয়া লইয়াছে, তারপর তাহাকে সম্পূর্ণরূপে নিজের অঙ্গীভূত করিয়া ফেলিয়াছে, কিম্বা দেশের মধ্যে তাহার অবস্থান এমন একটা অপ্রয়োজনীয় ও নিরর্থক জিনিষ করিয়া ধরিয়াছে যে পরিশেষে তাহাকে বিতাড়িত করিয়া দিতেও কোনও কষ্ট হয় নাই। অন্য দিকে, যখনই হিন্দুধর্ম্ম শত্রুর আক্রমণ হইতে আপনাকে কেবল বাঁচাইয়া ফিরিতে চাহিয়াছে, তখনই একটা সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছে ও সেই সময়ের মত তাহার শরীরে ক্ষয়ের চিহ্ন দেখা দিয়াছে।

ধর্ম্মের ক্ষেত্রে দেশের অন্তরাত্মা যখন একবার জাগিয়া উঠিল, তখন সকল রকম আধ্যাত্মিক ও মানসিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে সেই অন্তরাত্মার বিকাশ ও আবেশ, শুধু সময়ের ও সুযোগের

অপেক্ষায় রহিল। বঙ্গভঙ্গের দরুণ দেশে যে দারুণ বিদেশী-বিদ্বেষ দেখা দিল তাহাই আনিয়া দিল এই সুযোগ। ক্রোধ, প্রতিহিংসা, বিদ্বেষ—এ সব বৃত্তি নিজেরা যে কিছু প্রশংসার্হ, তাহা নয়; তবে ভগবান তাঁহার উদ্দেশ্যসাধনের নিমিত্ত এই সকল জিনিষও কাজে ব্যবহার করেন, অমঙ্গল হইতে তিনি মঙ্গলের সৃষ্টি করেন। এই বৃত্তিগুলিই দেশের জড়তা, ঔদাসীন্য দূর করিল ও তৎপরিবর্ত্তে আনিয়া দিল উৎসাহ, বিপুল আবেগ; এই উৎসাহ ও আবেগকে ধরিয়াই দেশের অন্তর-পুরুষ ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের আয়োজন করিয়া চলিল। ইউরোপায়দের প্রতি বিদ্বেষ, তাহাদের বাণিজ্য ও পণ্যদ্রব্যের উপর প্রতিহিংসা, তাহাদের সম্পর্কিত যাহা-কিছু সমস্তের উপর ঘৃণা, দেশের মধ্যে যে ক্রুদ্ধ মনোভাব বহাইয়া দিল তাহার ফল হইল অব্যবহিত পূর্ব্ব-যুগের ইংরাজী-ভারত লোপ পাইল, দেশ মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল; আর যে অনুপ্রেরণা ধর্ম্মজীবনে আমাদের আগে হইতেই দেখা দিয়াছিল, তাহাই এই উন্মুক্ত পথ দিয়া আমাদের রাজনীতিক জীবনে প্রবেশ করিল, দেশের নিজের অতীতের দিকে আমাদের মুগ্ধ দৃষ্টি গিয়া পড়িল, তাহার একটা সত্যকার নিজস্ব ভবিষ্যতের জন্য আমাদের প্রাণ দুর্জয় আবেগে উন্মুখ হইয়া উঠিল। ভারতের যে নিজস্ব প্রতিভা তাহা বাস্তবে এখনও আমাদের সমস্ত রাজনীতিক ক্ষেত্রকে অধিকার করিতে পারে নাই—তবে প্রাণে ভাবে সে-বস্তু যে সজীব ও বিজয়ী হইয়া উঠিয়াছে তাহার আর সন্দেহ নাই। রাজনীতিক ক্ষেত্রে যাহা-কিছু ঘটিতেছে

তাহাই দেশের সত্যকার আত্মস্বরূপ প্রকাশ করিয়া ধরিবার জন্য সাহায্য করিতেছে ; বাকি যাহা-কিছু তাহার শুধু সময়ের অপেক্ষা। দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমরা এখন নিশ্চিন্ত হইতে পারি। ধর্ম্ম ও রাজনীতি, এই দুইটিই হইতেছে দেশের অন্তর-পুরুষের সর্ব্বাপেক্ষা কার্য্যকরী প্রকাশের ধারা, দেশের প্রাণের পরিচয় মুখ্যত এই দুইটির মধ্যে ; ইহারাই যখন দেশায় ভাবে অনুপ্রাণিত হইতেছে, তখন আর যাহা প্রয়োজন তাহা যথাসময়ে আমাদের আসিবেই। আমাদের আধ্যাত্মিক ও রাজনীতিক জীবনের প্রয়োজনই বর্ত্তমানে সকল প্রয়োজনের উপরে, ইহারাই এখন সত্যকার ও জীবন্ত বস্তু ; এই প্রয়োজনের অনুসারেই আমাদের সমাজ, আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য নূতনরূপে গড়িয়া উঠিবে, আমাদের সাহিত্যে দর্শনে বিজ্ঞানে শিল্পে—ইউরোপের নয়, ভারতেরই একটা অভিনব নিজস্ব প্রতিভা মূর্ত্ত হইয়া উঠিবে।

এই ধরণের একটি প্রেরণা ইতিমধ্যেই বাঙ্গালীর সাহিত্যে ও শিল্পে কাজ করিতে সুরু করিয়াছে। রাজনীতিক ক্ষেত্রে নিজের স্বরূপকে প্রকাশ করিয়া ধরিবার প্রয়োজনের বশে দেশের অন্তর-পুরুষ বঙ্গ-সাহিত্যকে সহসা তাহার সত্যকার সনাতন নিজত্বের চেতনায় প্রবুদ্ধ করিয়া দিল ; এই আত্মোপলব্ধি ফুটিয়া উঠিল দেশের জাতীয় সঙ্গীতের মধ্যে। গীতি-কাব্য, গীতি-কবিত্ব, সহজ সরল মর্ম্মস্পর্শী কথা, গভীর তীব্র আবেগ, অসম্বৃত আত্মহারা উৎসাহ, মাধুর্য্যে সামর্থ্যে মিশ্রিত প্রেম ও ভক্তির উদাত্ত মূর্চ্ছনা, হৃদয়ের অপরোক্ষ অনুভবের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সবল মস্তিষ্ক,

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপের মধ্যে বাস্তবের ক্ষেত্রেই শরীরী হইয়া উঠিতেছে যে অতীন্দ্রিয় ভাব-সমাধি, যে আধ্যাত্মিক সূক্ষ্মদৃষ্টি—ইহাই হইল বাঙ্গলার প্রাণ। আমাদের সাহিত্য যদি সম্পূর্ণরূপে জীবন্ত হইয়া উঠিতে চায়, তবে এই প্রতিষ্ঠা হইতে তাহাকে আরম্ভ করিতে হইবে, তাহাতে যত পরিবর্ত্তন যত নব নব বৈচিত্র্যই ফুটিয়া উঠুক না কেন, এই মূল রাগের সহিত সংযোগ কখন যেন সে হারাইয়া না বসে। এই বঙ্গদেশেই আবার দেশের অন্তর-পুরুষ শিল্প-কলায় আপনার সার্থকতা পাইতে চাহিতেছে। মোগলদের পরে দেশের একটা নিজস্ব শিল্প এই প্রথম গড়িয়া উঠিতেছে—তাহার প্রবর্ত্তক ও গুরু হইতেছেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। অবশ্য এই শিল্প-সৃষ্টিতেও বিদেশী প্রভাবের ভেজাল কিছু দেখিতে পাই। তবে সে বিদেশ এসিয়ার বাহিরে নয়। গুরু এই প্রভাবের বশবর্ত্তী হইয়া গোড়াপত্তন করিয়াছিলেন, তাই তাঁহার পন্থায় যে শিষ্যেরা চলিয়াছেন তাঁহাদের সৃষ্টিতে একটা পরদেশী কি ভাব যেন লাগিয়া রহিয়াছে। কিন্তু এই প্রভাবও খুব সাময়িক বলিয়াই মনে হয়। কারণ, ইতিমধ্যেই আমরা লক্ষ্য করিলে দেখিতে পারি দেশের অন্তর-পুরুষ এই প্রভাবটুকু হইতেও আপনাকে মুক্ত করিয়া লইতেছে, একান্ত নিজস্ব রূপেরই মধ্যে আপনাকে বিকশিত করিয়া ধরিতেছে। এই ক্ষেত্রেও বাংলা প্রকাশ করিতেছে বাংলারই বিশিষ্ট প্রকৃতি। ভারতের শিল্পকলা চাহিয়াছে রূপের মধ্যে, সীমার মধ্যে অরূপের ও অসীমের কিছু প্রকাশ করা। গ্রীকেরা এত উর্দ্ধে দৃষ্টিপাত

করে নাই, তাহাদের লক্ষ্য ছিল অপেক্ষাকৃত সহজলভ্য; তাই তাহারা পাইয়াছিল পূর্ণ সিদ্ধি, তাহাদের সাফল্যে কোন ত্রুটি ধরিবার নাই। স্থূলরূপের সৌন্দর্য্যানুভব আমাদের চেয়ে তাহাদের ছিল বেশী, তবে সূক্ষ্ম রেখার ও বর্ণের সৌন্দর্য্যানুভব তাহাদের অপেক্ষা আমাদেরই বেশী। আমাদের ভবিষ্যতের শিল্প বস্তুকে ধরিয়া বস্তুর অন্তরাত্মাকে কি প্রকারে প্রকাশ করা যায় এই সমস্যা সমাধান ত করিবেই—কারণ, ভারতীয় শিল্পের ইহাই বৈশিষ্ট্য। তাহারই সাথে আবার অর্থভূয়িষ্ঠ রূপ ও বর্ণকে নির্দ্দোষ করিয়া ধরিবে, নূতন ভঙ্গীতে উভয়ের মধ্যে এক অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য স্থাপন করিবে। বাঙ্গালীর মত আর কোন ভারতবাসীরই এমন সজাগ রূপবোধ নাই। অন্যান্য ভারত-বাসীর মত একটা বৈদান্তিক দৃষ্টি তাহারও জন্মসিদ্ধ; তদ্ব্যতীত বাঙ্গালীর আছে সৌকুমার্য্য, লালিত্য ও সামর্থ্যের দিকে একটা প্রবল আকর্ষণ। শিল্পের নূতন ধারা যখন বাঙ্গলায় প্রবর্ত্তিত হইল তখন স্বভাবতই বাঙ্গালীর ঝোঁক ঠিক এইগুলির দিকেই গিয়া পড়িল। প্রাচীন ভারতের যে সামান্য শিল্পাবশেষ এখনও বর্ত্তিয়া আছে, তাহার মধ্যে বাঙ্গালী শিল্পের একটা অখণ্ড পূর্ণ আদর্শ পাইল না, তাই বাধ্য হইয়া তাহাকে জাপানের সহায় গ্রহণ করিতে হইয়াছে—কারণ, জাপানী-শিল্প লালিত্য ও সৌকুমার্য্যের পরাকাষ্ঠা। কিন্তু বস্তুর গভীরতম অন্তরাত্মাটি প্রকাশ করিবার রহস্য জাপান জানে না, জাপানের লক্ষ্য তাহা নয়। বাঙ্গালীর প্রতিভা কেবল সৌকুমার্য্য, লালিত্য ও সামর্থ্যের

সম্মেলন নয়; সেখানে আছে গানের মূর্চ্ছনার মত লোকাতীত প্রহেলিকার দিকে একটা গতি, তাহারই সাথে আবার প্রসাদগুণের, সুষীম রূপণের উপর প্রগাঢ় প্রীতি। তাই বাঙ্গালীর সাহিত্যের মত, তাহার শিল্পেও এই সব বৃত্তিগুলিই ফুটিয়া উঠিয়াছে—পরিষ্কার রেখাপাত ও রূপায়ণের মধ্যে ওতপ্রোত হইয়া আছে একটা সৌন্দর্য্যাবেগ, একটা অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্য ও অধ্যাত্মভাব। এখানেও দেখিতেছি দেশের স্বাধীন অন্তরপুরুষ বিদেশীর বন্ধন ও শৃঙ্খল হইতে আপনাকে বিমুক্ত করিয়া ধরিতেছে।

এই যে বিপুল সৃজনী সঞ্জীবনী শক্তি, তাহার প্রভাব হইতে আমাদের জীবনের কোন আয়তনই রক্ষা পাইবে না। কোন সন্দেহই নাই, আমাদের সমাজকে এমন নূতন করিয়া গড়িতে হইবে, যে তাহা হয়ত একটা বিপ্লবেরই সামিল হইয়া পড়িবে। কিন্তু সে-বিপ্লব ভারতের সমাজকে ইউরোপীয় সমাজের ছাঁচে ঢালিয়া গড়িবে না—এ বিষয়ে সাধারণ সমাজ-সংস্কারকেরা অন্ধভাবে যে-আশাই পোষণ করুন না, সে-বিপ্লবের লক্ষ্য হইবে সমাজের মধ্যে দেশের অন্তরের স্বধর্ম্মকে আরও পূর্ণরূপে সুষ্ঠুরূপে মূর্ত্ত সত্য করিয়া প্রতিষ্ঠা করা। ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা নয়, রেষারেষি করিয়া পরস্পরের ধ্বংস-সাধন নয়; কিন্তু প্রীতি-ভালবাসা, একই অভিন্ন জীবন-ধারায় সকল ব্যক্তিকে সংযুক্ত করিয়া ধরা—ইহাই হইল ভারতের সমষ্টিগত জীবনের প্রেরণা। অতীতে এই প্রেরণাই ফুটিয়া উঠিয়াছিল একান্নবর্ত্তী পরিবারের মধ্যে, গ্রাম্য-সমিতির মধ্যে, চাতুর্ব্বর্ণ্যের মধ্যে। একান্নবর্ত্তী

পরিবারে মিলনের সূত্র ছিল রক্তের সম্বন্ধ, গ্রাম্য-সমিতিতে মিলনের সূত্র ছিল একটা সমবায়-পদ্ধতি, চাতুর্ব্বর্ণ্যে মিলনের সূত্র ছিল জন্মাধিকার ও গোষ্ঠীগত মর্য্যাদাবোধ। ভবিষ্যতে এই মিলনের সূত্র আরও সর্ব্বাঙ্গস্থন্দর হইবে, আধ্যাত্মিকতাময় হইয়া উঠিবে—এই আশাও করিতে পারি। ব্যবসা-বাণিজ্যেও যদি আমরা ইউরোপীয় ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া ইউরোপীয় আদর্শের অনুসরণ করি, যদি চাহি ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে স্বার্থের প্রতিযোগিতা, কেবল লাভের জন্য দল-বাঁধা—কিম্বা আজকাল-কার যুগের সর্ব্বনাশা যে বিরাট মহাজনী কারবার অর্থাৎ কয়েক-জনে বা কয়েকটি দলে মিলিয়া পৃথিবীর সকল বাণিজ্যের অধি-পতি হওয়া, যাহার নাম ইংরাজীতে ট্রাষ্ট (Trust) বা সিণ্ডিকেট্ (Syndicate), তাহাই যদি আমাদের লক্ষ্য হয় তবে আমরা কখনও দেশের অর্থনীতিক জীবন নূতন করিয়া নিরাময় করিয়া গড়িতে পারিব না। এই সব ধরণের মিলন-সূত্র ভারতকে কখন এক করিয়া ধরিবে না। ভারত যে জীবনের সন্ধানে চলিয়াছে তাহার গভীরত্ব, তাহার মহত্ত্ব, তাহার বিপুলতা পৃথিবীর মানুষ আজও কল্পনা করিতে পারে না। সেই জীবনের রহস্য ভারত যখন পাইবে, তাহাকে যখন বাস্তবের মধ্যে প্রকাশ করিবার কৌশলও অধিকার করিবে, তখনই ভারতের সামাজিক ও অর্থ-নীতিক জীবনও সমর্থ ও সমৃদ্ধ হইয়া চলিবে।

স্বদেশী এযাবৎ বেশীর ভাগই ছিল ইউরোপের ছাঁচে আমা-দিগকে ঢালিয়া গড়িবার প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহ।

কিন্তু তাই বলিয়া ভারতীয় যাহা-কিছু পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাহা ধরিয়া চলিবার যে প্রবৃত্তি সেটিরও যেন আমরা বশীভূত না হইয়া পড়ি, এ-বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। অতীতে হিন্দুত্বের এ রকম প্রকৃতি ছিল না, ভবিষ্যতেই যে এ রকম হইবে, এমনও কোন কারণ নাই। সকল জীবনধারায় আছে তিনটি স্তর—প্রথমে, চিরস্থির সনাতন যে-আত্মা (Spirit); দ্বিতীয়, অন্তরাত্মা Soul), যাহা পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া আপনাকে বিকশিত করিয়া তুলিয়াছে অথচ সকল পরিবর্ত্তন-বিবর্ত্তনের মধ্যে একই রহিয়াছে; আর তৃতীয় হইতেছে ভঙ্গুর নিত্যপরিবর্ত্তনশীল দেহ। আত্মাকে আমরা পরিবর্ত্তন করিতে পারি না, তাহাকে ঢাকিয়া রাখিতে পারি, বা হারাইয়া ফেলিতে পারি। অন্তরা-রাত্মার সহিত বিশেষ সাবধানে আমাদের কারবার করা উচিত; জোর করিয়া যেন পরধর্ম্মের ছাঁচে তাহাকে না ঢালিতে চাই, তাহার স্বাধীন প্রসারে যেন কোন বাধা না দিয়া বসি; আর শরীরকে ব্যবহার করিতে হইবে কেবল যন্ত্ররূপে, তাহার নিজস্ব একটা মূল্য আছে এই বিশ্বাসে যেন তাহার উপর অতিমাত্রায় আকৃষ্ট না হইয়া পড়ি। অকারণ পরিবর্ত্তনের লোভে পড়িয়া আমরা প্রাচীনের কোন বাহ্য রূপকেই পরিত্যাগ করিব না; আবার দেশের অন্তর-পুরুষ যদি পুরাতন কিছুকে ফেলিয়া দিতে বলে, দেশের অমর অন্তরাত্মার সুষ্ঠুতর ও সত্যতর প্রকাশ যাহাতে হয় এমন নূতন কিছু সে চায়, তবে তাহাতেও আমরা পশ্চাৎপদ হইব না।।

ত্যাগ-ধর্ম্ম

আত্মত্যাগের প্রতিভা সকল দেশের কি সকল ব্যক্তির সাধারণ সম্পত্তি নয়। এ-বস্তুটি যেমন বিরল, তেমনি মহামূল্য। মানবজাতির নৈতিক জীবনে যে ক্রমোন্নতি তাহারই পরিণতি এইখানে, আমরা যে অহং-সর্ব্বস্ব পশুত্ব হইতে অহংশূন্য দেবত্বের দিকে ক্রমে উঠিয়া চলিয়াছি তাহার প্রমাণ এই এখানে। যে মানুষ আত্মত্যাগ করিতে জানে, তাহার আর যে-পাপই থাকুক না কেন, সে পশুকে অনেক পিছনে ফেলিয়া আসিয়াছে; তাহারই মধ্যে ভবিষ্যতের বৃহত্তর মানুষতার বীজ উপ্ত হইয়াছে। যে জাতি সমষ্টিগতভাবে একটা কিছু আত্মত্যাগ করিতে পারিয়াছে, সে জাতি আপন ভবিষ্যৎকে নিঃসন্দেহে বাঁচাইয়াছে।

জীবন ধারণ করিতে হইলে কোন না কোন প্রকারের আত্মত্যাগ আমাদের স্বীকার করিতেই হইবে, তাহা অনিচ্ছাকৃত হউক আর স্বার্থপরতার আবরণে আবৃত হউক। এই আত্মত্যাগের বৃত্তি মানব-সমাজে ক্রমে ক্রমে বিকাশ পাইয়াছে। গোড়ায় সব আত্মবলিই স্বার্থজনিত হইয়া থাকে—তখন তাহার অর্থ নিজের উন্নতির জন্য অপরকে বলি দেওয়া। তারপর ক্রম-বিকাশের প্রথম পদক্ষেপ হইতেছে যখন দেহজ আকর্ষণের বশে মাতা তাহার শিশু-সন্তানের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত হয়,

যখন রক্ষণের প্রবৃত্তি পুরুষকে স্ত্রীর জন্য জীবন দিতে উদ্‌যুক্ত করে। আত্মবলির প্রবৃত্তি দেখিয়াই আমরা বুঝিতে পারি যে আমিত্বের বোধ প্রসার পাইয়াছে। যতদিন পর্য্যন্ত "আমি"র জ্ঞান কেবল নিজের শরীর ও শরীরজ কামনার মধ্যে আবদ্ধ থাকে, ততদিন জীবের হইতেছে প্রাকৃত ও পাশব অবস্থা। তারপর "আমি"র পরিধি বিস্তৃত হইয়া যখন স্ত্রীকে ও সন্তানদিগকে আপনার অন্তর্ভুক্ত করিয়া লয় তখন হইতেই ক্রমোন্নতির সম্ভাবনা আরম্ভ। ইহাই গোড়ার মানব-অবস্থা; কিন্তু এখানেও পাশব ভাবের অবশেষ রহিয়া গিয়াছে দেখিতে পাই—কারণ, স্ত্রীকে ও সন্তানকে এখানে তৈজস-পত্রেরই মধ্যে গণ্য করা হয়, নিজের সুখের সামর্থ্যের মর্য্যাদার উপকরণরূপে তাহাদের ব্যবহার করা হয়। তবুও পরিবার যখন এই ভাব দিয়া গঠিত, তখনই সভ্যজীবনের সূত্রপাত, সামাজিক জীবন যে সম্ভব হইয়াছে তাহার মূলও এইখানে। কিন্তু মানুষের মধ্যে যে ভগবান তাঁহার প্রকৃত প্রকাশ আরম্ভ হইয়াছে আরও পরে, যখন নিজের জীবনের অপেক্ষা নিজের পরিবার এত প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে যে তাহার জন্য মানুষ আত্মবলি দিতে পারে, তাহার পোষণের ও রক্ষণের জন্য নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জন দিতে পারে। পরিবারের জন্য নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দেওয়া—এই পর্য্যন্ত উন্নতি সকল মানুষেরই এক রকম হইয়াছে। পত্নীর ধর্ম্মরক্ষার জন্য, শত্রুর হাত হইতে ঘর বাঁচাইবার জন্য জীবন-দান মানুষের মধ্যে একটা উচচতর

প্রকৃতির পরিচয়—ব্যক্তিগত হিসাবেই মানুষের এই ক্ষমতা আছে, সমষ্টিগতভাবে নাই। পরিবারের উপরে হইতেছে গোষ্ঠী—মানুষের নিজত্ববোধ আরও কিছু বিস্তৃতি লাভ করে যখন দেহের মধ্যে নিজত্ব-বোধ ছাড়াইয়া, পরিবারের মধ্যে নিজত্ব-বোধকে অতিক্রম করিয়া মানুষ গোষ্ঠীর মধ্যে নিজত্ব অনুভব করে। পরিবারের অপেক্ষা গোষ্ঠীর দাবি বড়—এই বোধ যখন হয় তখনই সামাজিকতার আরম্ভ. এই বোধ ছাড়া কোন সামাজিক জীবন থাকিতেও পারে না। এই অবস্থাতেই কুলের গণ্ডী ভাঙ্গিয়া tribe-এর উদ্ভব হইয়াছে, নানা রকম গোষ্ঠীগত প্রতিষ্ঠান সুষ্ঠুরূপে গঠিত হইয়াছে—আমাদের "পল্লী-সমাজ" (village community) তাহারই আদর্শ নিদর্শন। এই ক্ষেত্রেও, গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন পাইতে হইলে সকলের প্রথম প্রয়োজন পারিবারিক স্বাথকে গোষ্ঠীর (জনপদের) বৃহত্তর স্বার্থের কাছে বলি দিবার জন্য সকলের প্রস্তুত থাকা। মানুষের অন্তরাত্মা প্রসারিত হইতে হইতে যখন গোষ্ঠী-বোধে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে. তখন যে ভাগবত বৃত্তি তাহার মধ্যে স্ফূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে তাহা গোষ্ঠীর সেবায় এই প্রাণদানের সামর্থ্য। অন্ত-রাত্মার আরও বৃহত্তর প্রসার হইয়াছে জাতি বা দেশবোধের মধ্যে। মানবজাতির ক্রমোন্নতির জন্য বর্ত্তমান যুগে এই দেশ বা নেশনের বিকাশই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান প্রয়োজন। ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা, পারিবারিক স্বার্থপরতা, শ্রেণীগত স্বার্থপরতা অতীত সংস্কারের বলে এখনও অনেকখানি বলীয়ান—এ সকলকেই দেশের বিশাল-

তর সত্তার মধ্যে ডুবাইয়া দিতে হইবে, নতুবা মানবজাতির মধ্যে ভগবানের ক্রমবিকাশ থামিয়া যাইবে। সেই জন্যই স্বাদেশিকতা হইতেছে বর্ত্তমানের যুগধর্ম্ম—ভগবান আজ দেশমাতারূপে আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত। নেশন বা স্বদেশ গড়িবার প্রথম চেষ্টা যে হয় তাহার উদাহরণ গ্রীকদের নগরী, সেমাইট বা মোঙ্গলদের রাজতন্ত্র, কেল্টিকদের গোষ্ঠী (clan) ও আর্য্যদের কুল বা জাতি। এই সকল আদর্শ মিশাইয়া মধ্যযুগের জাতি বা নেশন গড়িয়া উঠিয়াছিল ও আধুনিক যুগের দেশগত জনসঙ্ঘ দেখা দিয়াছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব ক্ষেত্রের মত এখানেও, দেশের বা নেশনের মধ্য দিয়া মানব-জাতির সার্থকতা সম্ভব হইয়াছে তখনই যখন দেশের বৃহত্তর স্বার্থের কাছে মানুষ তাহার নিজের স্বার্থ, পরিবারের স্বার্থ ও শ্রেণীর স্বার্থকে বলি দিতে প্রস্তুত হইতে পারিয়াছে; দেশের জন্য প্রাণ দিয়া দেশের সহিত আমাকে একীভূত করিয়া দেওয়াই এখানে আমার ব্যক্তিগত সত্তার চরম বিকাশ ও সার্থকতা। ইহারও উপরে আছে আর এক বিশালতর সার্থকতা, কিন্তু সেইটির জন্য খুব অল্প মানুষই বর্ত্তমানে প্রস্তুত—তাহা হইতেছে নিজত্বকে প্রসারিত করিয়া সমস্ত মানবজাতিকে আলিঙ্গন করিয়া ধরা। অবশ্য, বিশ্বমানবকে আদর্শ করিয়া তাহার সেবায় দুই চারিজন আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন; এবং তাঁহাদের এই প্রয়াস মানবজাতির উন্নতির লক্ষণ সন্দেহ নাই; তবুও জগতের সকল মানুষের বৃহত্তর স্বার্থের জন্য নিজের দেশের স্বার্থ বিসর্জন দেওয়া সাধারণ মানুষের পক্ষে

এখনও সম্ভব হয় নাই। ভগবান ধীরে ধীরে আগে ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া চলেন, অকালেই যাহাতে গাছে ফল ধরে সে জন্য ব্যস্ত হইয়া তিনি কিছুমাত্র চেষ্টা করেন না। সময় আসিলে মানুষ মানবজাতির জন্য অবহেলায় জীবন দান করিবে; কিন্তু সে সময় এখনও আসে নাই। তা ছাড়া, নিম্নতর স্তরের সাধনা পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই মানুষ যদি এই ঊর্দ্ধ্বতর সাধনার প্রয়াস করে, তবে তাহা কল্যাণকর হইবে না; কারণ তাহা হইলে বাধ্য হইয়া মানুষকে এক সময়ে নীচে নামিয়া আসিতে হইবে, যে স্তরের সাধনা সে ছাড়িয়া গিয়াছে বা অসম্পূর্ণ রাখিয়া গিয়াছে তাহা আবার পাকা করিয়া গাঁথিয়া তুলিতে হইবে। মানবজাতি ধীরে ধীরে উন্নতির দিকে অব্যর্থভাবে চলিয়াছে; সুতরাং পিছনের প্রধান ঘাঁটি-স্থান কোথাও ফেলিয়া গিয়া খুব দূরের একটা লক্ষ্য আগেভাগে গিয়া দখল করিয়া বসায় বিশেষ কোন লাভ হয় না।

দেশের যে আমিত্ব তাহা হয়ত অনেক সময়ে সমষ্টিগত স্বার্থপরতা ছাড়া আর বেশী কিছু নয়। আমি আমার ধনসম্পত্তি আমার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিতে যে প্রস্তুত থাকি, তাহার অর্থ হয়ত শুধু এইটুকু যে আমার ধন-দৌলত আমার যশ আমার পদ-মর্য্যাদা অক্ষুণ্ন থাকিতে পারে তখনই যখন আমার দেশ স্বাধীন সমর্থ সমৃদ্ধ। এ সবই, আরও অনেক জিনিষ আমি দেশের জন্য ত্যাগ করিতে পারি, কারণ দেশ রক্ষা পাইলে আমার নিজের ঘরবাড়ীও রক্ষা পায়। দেশের জন্য আরও

বেশী আমি ত্যাগ স্বীকার করিতে প্রস্তুত ; কারণ দেশের উন্নতি ঐশ্বর্য্য সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আমার দলের বা শ্রেণীর উন্নতি ঐশ্বর্য্য সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আনিয়া দিবে। এমন কি, দেশকে বড় করিয়া তুলিবার জন্য আমি আমার বলিয়া যাহা-কিছু আছে সবই বিসর্জন দিতে পারি ; কারণ আমার দেশে আমার গৌরব, আমার দেশকে আমি সকল দেশের মাথার উপরে রাজচক্রবর্ত্তী হইয়া বসিতে দেখিতে চাই। যে বৃহত্তর জীবনের উদ্দেশ্য হইতেছে মানষকে স্বার্থপরতা হইতে মুক্ত করিয়া তোলা, তাহারও মধ্যে স্বার্থপরতার এই সকল নানা রকমফের মানুষকে অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। এই স্বার্থপরতার জের টানিয়া চলিয়াছে বলিয়াই আধুনিক সকল নেশন নানা রোগে জর্জরিত—যেমন, ধনীদের প্রভুত্ব, অন্য দেশের উপর আধিপত্য। দম্ভ, অন্যায়, অবিচার প্রভৃতি যাহা কিছু একটা নেশনকে তাহার অভ্যুদয়ের অবস্থায় পাইয়া বসে, সেই সমস্তেরই মূল এইখানে। যে অনিবার্য্য অবনতির ধারায় মানুষ তখন চলিতে থাকে তাহা প্রাচীন গ্রীকেরা বড় সুন্দর ব্যক্ত করিযা গিয়াছেন—সম্পদের পর অবিচার অত্যাচার, অবিচার অত্যাচারের পব "এটি"(Ate), সেই অন্ধ-মোহ যাহাকে ধরিয়া বিধাতাপুরুষ ব্যক্তির ও জাতির ধ্বংস-সাধন করিয়া থাকেন। এই যে রিপুটি মানুষের সঙ্গে সঙ্গে বরাবর চলিয়াছে তাহা হইতে মুক্তি পাইতে হইলে প্রয়োজন দেশকে সমগ্র মানবজাতির অন্তর্ভুক্ত করিয়া ধরা, বিশ্বমানবের মহামিলন ক্ষেত্রে একটি কেন্দ্ররূপে দেখা—এই ভাবেই দেশের আবশ্যকতা ও সার্থকতা, দেশকে

ইহার বেশী কিছু করিয়া দেখিতে গেলেই গোলমালের সূত্রপাত।

একটা দেশের জীবনে দুইটি অবস্থা আছে—এক, যখন সে গড়িয়া বা নূতন করিয়া গড়িয়া উঠিতেছে, আর যখন সে গঠিত, সুনিয়মিত শক্তিমান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রথম অবস্থাতেই স্বাদেশিকতা দেশবাসীর উপর ব্যক্তিগত হিসাবে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পরিমাণে দাবিদাওয়া করে—আর তাহা ন্যায়সঙ্গত। কিন্তু দ্বিতীয় অবস্থায় সেই দাবির পরিমাণ হ্রাস হওয়া উচিত—নিজের সার্থকতা লাভ করিয়া দেশের কর্ত্তব্য বিশ্বমৈত্রীর মধ্যে আপনাকে বাঁচাইয়া রাখা। ব্যক্তি যেমন আপনাকে পরিবারের মধ্যে বাঁচাইয়া রাখিতেছে, পরিবার যেমন শ্রেণীর মধ্যে, শ্রেণী যেমন দেশের মধ্যে আপনাকে বাঁচাইয়া রাখিতেছে—অনর্থক নিজের ধ্বংস-সাধন করে নাই, কিন্তু নিজের হইতে বৃহত্তর কিছু স্বার্থের সেবায় নিযুক্ত হইয়াছে—সেই রকম দেশও জগতের সেবায় নিজের নিজত্ব জিয়াইয়া রাখিবে। অবশ্য একটি পরাধীন দেশ যেমন নিজের স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার জন্য সচেষ্ট হয় তখন বৃহত্তর স্বার্থটি দূর-ভবিষ্যতের আদর্শরূপেই সে দেখিতে পারে, তাহা স্বদেশ-সেবারই উদার উচচতর অনুপ্রেরণা হইয়া দাঁড়াইতে পারে। তখন বৃহত্তর স্বার্থের জন্য দেশের পক্ষে কোন-আত্ম-ত্যাগই সম্ভব নয়; কারণ দেশকে আগে রক্ষা পাওয়া চাই, তবেই না সে তাহার নিজের স্বার্থ বৃহত্তর স্বার্থের কাছে বলি দিতে পারে।

কর্ম্মযোগীর আদর্শ

আমরা আজ ভারতবর্ষে প্রথম স্তরে, আমাদের দেশ এখন সবে গড়িয়া উঠিতেছে ; এই অবস্থায় দেশের আহ্বানের উপরে আর কোন আহ্বান নাই। আমাদের দেশের যে আপদকাল উপস্থিত, তাহা হইতে উদ্ধার পাইয়া যদি সে কেবল বাঁচিয়া বর্ত্তিয়াও থাকিতে চায় তবে প্রথম ও একমাত্র প্রয়োজন হইতেছে দেশের ব্যক্তিরা, পরিবারবর্গ, শ্রেণী সকলে দেশকেই পরম ইষ্টরূপে ধরিয়া আপন আপন স্বার্থ বলি দিয়া চলিবে। দেশের নব অভ্যুত্থানের প্রত্যেকটি তরঙ্গ কষ্টস্বীকারের, আত্মদানের জন্য আহ্বান ছাড়া আর কিছু নয়। স্বদেশী, সালিসী, জাতীয় শিক্ষা এবং সকলের উপরে "নিরস্ত্র প্রতিরোধ" (passive resistance)—ইহাদের প্রত্যেকটি এই রকমের এক এক আহ্বান। যদি দেশের স্বার্থের জন্য আমরা আমাদের ব্যক্তিগত ও পরিবারগত স্বার্থ বিসর্জন না দিতে পারি, তবে ঐ কাজের কোনটিই সফল হইবে না। এখন আবার আর একটি নূতন ডাক আস্তে আস্তে স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে—তাহা উচ্চতর শ্রেণীদের জন্য ; জাপানের 'সামুরাই' শ্রেণী যাহা করিয়াছিল, নিম্নতর শ্রেণীদের উত্তোলনের জন্য আমাদের উচ্চতর শ্রেণীদের তাহাই করিতে হইবে। ভারতকে যদি 'নেশন'রূপে গড়িয়া তুলিতে হয় তবে গোড়াপত্তন করিতে হইবে দেশবাসী সকলের মধ্যে একটা অকুণ্ঠ আত্মত্যাগের উৎসাহ ছড়াইয়া দিয়া। এই সত্যটির প্রমাণ পাইবার জন্য বেশী কষ্ট স্বীকার করিবার প্রয়োজন হয় না। আমরা দেশসেবাকল্পে যে আন্দোলনের প্রবর্ত্তন করিয়াছি, তাহার বিশেষ

ধরণটির দিকে নজর দিলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারিব। তা ছাড়া ইতিহাস ও অভিজ্ঞতাও ঐ একই কথা বলিতেছে! প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আত্ম-ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে ইতিহাস ও অভিজ্ঞতার কষ্টি-পাথরে বিচার করিয়া দেখা উচিত—অনেক সাবধানী এই উপদেশ দিয়া থাকেন। কিন্তু আমাদের কাছে এ রকম উপদেশের কোন সার্থকতা নাই। আমরা দেশ-সেবকের দল আমাদের দীপ্ত আদর্শের আমাদের ত্যাগ-স্বীকারের দ্বারা দেশের হৃদয়কে জয় করিযাছি; আবার ঠিক সেই রকমে অতীত ইতিহাস বা বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রমাণ দিয়া দেশের বুদ্ধিকেও তৃপ্ত করিয়াছি। প্রত্যেক ব্যক্তির সম্বন্ধে, প্রত্যেক অবস্থায় সমস্ত সমস্যাটি যে আবার আগাগোড়া বিচার করিয়া লইতে হইবে—এই দাবি অত্যধিক ও অসম্ভব বলিয়া আমরা বিবেচনা করি। মোটামুটি যদি আমরা আত্মত্যাগের সার্থকতা বুঝিয়া থাকি এবং ব্যক্তিগত জীবনে যদি সেই আত্ম-ত্যাগের প্রেরণা অনুভব করিয়া থাকি—তবে তাহাই যথেষ্ট। আমাদের মনে রাখা উচিত, যে জাতি সংগঠিত, স্বাধীন ও বর্দ্ধিষ্ণু তাহার অবস্থা দিয়া যে জাতি দীন পরাধীন, সবে উঠিতে চেষ্টা করিতেছে, তাহার বিচার করা সঙ্গত নয়। স্বাধীন দেশে ব্যক্তি হিসাবে আত্মত্যাগ করিবার জন্য ঘন ঘন কিছু ডাক আসে না—সেখানে দেশ যে আত্মত্যাগ চাহে, তাহা সাধারণ গোষ্ঠীগত জীবনের ধরাবাঁধা নিয়মের অন্তর্ভুক্ত; তবে প্রয়োজনের সময়ে বিশেষ আত্মত্যাগের জন্য সকলকে প্রস্তুত থাকিতে হয়। পরাধীন দেশে কিন্তু বিশেষ আত্মত্যাগটাই নিত্য-

নৈমিত্তিক প্রয়োজন—সেই অবস্থায় প্রত্যেক ব্যক্তির প্রত্যেকটি সাহসের ও আত্মত্যাগের কাজ কি উপকার দিল বা না দিল তাহার হিসাব চাওয়া সুবুদ্ধির পরিচায়ক নহে। কর্ম্মের বিধাতা যখন পরাধীন দেশের নিকট হইতে স্বাধীনতার মূল্য চাহিতেছেন তখন দেশের লোকেরা বলিবে কি, "আমাদের প্রত্যেকটি ত্যাগ গণিয়া লও, তাহার পরিবর্ত্তে আমরা চাহি এই পরিমাণ লাভ—তোমার কি সর্ত্ত তাহা আগে আমাদিগকে জানাও ; এক পয়সা মূল্যের আমাদের যে-কষ্ট, তাহাও তোমার কাছে আমরা বাকী ফেলিয়া রাখিব না ?" এই ধরণের মানুষের দ্বারা, এই ধরণের মনোভাবের দ্বারা কোন দিন কোন পরাধীন দেশ স্বাধীন হয় নাই।

ক্রমবিকাশের ধারা

ক্রমবিকাশের কোন একটি বিশেষ পর্ব্ব যখন শেষ হইতে চলিয়াছে তখন দেখা যায় তাহার ভিতর হইতে যে-সব জিনিষ চলিয়া যাইবেই, ঠিক সেইগুলিই নূতন বল সঞ্চয় করিয়া ফিরিয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইযাছে। প্রকৃতির নিয়মই এই যে, মানুষের ব্যষ্টিগত বা গোষ্ঠীগত কোন গভীব সংস্কার বা তীব্র প্রেরণাকে তাড়াইতে হইলে, আগে সে জিনিষটি ভোগের দ্বারা নিস্তেজ করিয়া আনিতে হয়, তারপর নিগ্রহের দ্বারা বশীভূত করিতে হয়, এবং শেষে সংযমের দ্বারা অর্থাৎ প্রত্যাখ্যান ও উদাসীনতার দ্বারা তাহাকে বাহিরে ফেলিয়া দিতে হয়। নিগ্রহ ও সংযমের মধ্যে পার্থক্য আছে। নিগ্রহ যেখানে সেখানে, যে প্রবৃত্তিটি নিগ্রহ করিবার চেষ্টা হয় তাহাব সত্যতা সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই তোলা হয না—তাই সেখানে থাকে দমন করিবার, চাপিয়া রাখিবার, এমন কি পিষিয়া মারিবার একটা উগ্র প্রয়াস। কিন্তু সংযমের পথে, প্রবৃত্তিটিকে মৃত বা মুমূর্ষু বলিয়াই দেখা যায়; মাঝে মাঝে সেটি ফিরিয়া আসে বটে, কিন্তু প্রথমে তাহাতে হয় ঘৃণা, তারপর একটা অস্বস্তি এবং পরিশেষে সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য; এককালে যাহা বাস্তব ছিল তাহারই যেন প্রেতমূর্ত্তি, পদচিহ্ন বা ক্ষীণ প্রতিধ্বনি বলিয়া জিনিষটিকে মনে হয়, কিন্তু তখন

আর তাহার কোনই অর্থ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। প্রকৃতির লীলায় কোন একটি শক্তি যখন অনাবশ্যক হইয়া পড়ে ও ক্রমে লোপ পাইতে থাকে, তখন সম্পূর্ণ লোপ পাইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে তাহা আবার যে ফিরিয়া দেখা দেয়—এই নিয়ম প্রকৃতির ক্রিয়াপদ্ধতিরই একটা অঙ্গ।

অবশ্য যখন কোন শক্তি, গুণ বা বৃত্তি সবে মাত্র জাগিয়াছে এবং পূর্ণ বলে বলীয়ান, যখন সে তাহার প্রাপ্য ভোগ পায় নাই এবং কর্ম্মের জের শেষ হয়ে নাই, তখন সংযমের চেষ্টা বৃথা, সংযমের সময় তখনও হয় নাই। একটা জিনিষ যদি জন্ম গ্রহণই করিল তবে তাহার যৌবন ও পরিণতি, ভোগ ও আয়ুকাল, এবং শেষে ক্ষয় ও মৃত্যু থাকিবেই। প্রকৃতি যখন কোন বস্তুকে সৃষ্টি করিয়া জীবনের পথে ছুটাইয়া দেয় তখন সেই বস্তুর গতি-বেগ আপনা হইতেই ক্রমে মন্দীভূত হইতে হইতে যতক্ষণ শেষ হইয়া না যাইতেছে ততক্ষণ সে চলিবেই—ইহাই হইল প্রকৃতির বিধান। জবরদস্তি করিয়া অসময়ে জিনিষের গতি বা বাড় থামাইয়া দেওয়া হইতেছে নিগ্রহ; সাময়িক ফল তাহাতে পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু সে-ফল স্থায়ী হয় না। গীতা তাই বলিতেছে, সব জিনিষই আপন আপন স্বভাবের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, নিজের নিজের প্রকৃতি আশ্রয় করিয়াই সকলে চলে, সুতরাং নিগ্রহে কোন ফল হয় না। কারণ আসল ব্যাপারটি এই—অসময়ে গলা টিপিয়া যে-জিনিষটি মারিয়া ফেলা হয়, বাস্তবিক পক্ষে তাহা মরিয়া যায় না, প্রকৃতির মধ্যে শুধু তাহা কিছুকালের

জন্য আপনাকে গুটাইয়া রাখে ; তারপর আবার প্রকৃতিই তাহাকে বাহিরে টানিয়া আনে এবং তখন যে-ভোগ তাহাকে করিতে দেওয়া হয় নাই, তাহারই চরিতার্থতার জন্য বিকট ক্ষুধা লইয়া বিপুল বেগে সে ছুটাছুটি করিতে থাকে। যোগ সাধনার প্রথম অবস্থায় যখন কোন রিপু বা খারাপ সংস্কারের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য আমরা চেষ্টা করি তখন এই ধরণের একটা জিনিষ প্রায়ই ঘটে, দেখিতে পাই। ধরা যাক, ক্রোধ যেন আমাদের প্রকৃতিতে একটা প্রবল রিপু ; আমরা জোর জবরদস্তি করিয়া সেটি দমনে রাখিতে চেষ্টা করি এবং বলি, এই হইতেছে আত্ম-সংযম ; কিন্তু ফলে দেখি, হঠাৎ কোন সময়ে অজ্ঞাতে সেই রিপুটি আশ্চর্য্য বলে বলীয়ান হইয়া সংযমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে, আমাদিগকে কবলিত করিয়াছে। কোন রিপুর দাসত্ব হইতে যথার্থত মুক্তি পাইবার দুইটি উপায় আছে। প্রথম, সেই রিপুর যে বিপরীত বৃত্তি তাহাকে তৎস্থানে স্থাপনা করিয়া—যেমন, ক্রোধ উৎপন্ন হইলে তখন ক্ষমা বা প্রীতির উপর ধ্যান দিতে হয়, লালসা জাগিলে পবিত্রতার শরণ লইতে হয়, অহংকার হইলে নিজের দীনতার দিকে নজর দিতে হয়। ইহাই হইল রাজযোগের পথ। কিন্তু এ পন্থা কঠিন, মন্থর, অনিশ্চিত। কারণ, প্রাচীন কালের অনেক উদাহরণ হইতে এবং আধুনিককালেও অনেকের অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যায় যে বহুকাল ধরিয়া যে-যোগীরা আত্ম-সংযমের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া আসিয়াছেন, তাঁহারাও হঠাৎ প্রবৃত্তির দুর্দ্দমনীয়

আক্রমণে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছেন, যে-রিপু সম্পূর্ণ মৃত বা চিরকালের জন্য বশীভূত বলিয়া তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল তাহাই আবার দ্বিগুণ বলে ফিরিয়া আসিয়াছে। তবুও প্রকৃতির কাজের মধ্যে এই উপায়েরও ব্যবহার আছে দেখি। এই উপায়—অজ্ঞানে ও অর্দ্ধজ্ঞানে আশ্রয় করিয়াই মানুষের স্বভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া চলিয়াছে, জীবন হইতে জীবনান্তরে, এমন কি একই জীবনের গণ্ডীর মধ্যে ক্রমবিকাশ লাভ করিতেছে। কিন্তু বৃত্তির বীজ এইভাবে নষ্ট হয় না, আর যোগের দ্বারা বীজই যদি পুড়িয়া ভস্মসাৎ না হইল তবে সে-বীজ যখন-তখন আবার অঙ্কুরিত হইয়া উঠিতে পারে, শাখা পল্লব লইয়া বিরাট মহীরুহে পরিণত হইতে পারে। দ্বিতীয় উপায় হইতেছে, রিপুকে ভোগের দ্বারা চরিতার্থ করা, যাহাতে শীঘ্র শীঘ্র তাহার হাত হইতে মুক্তি পাওয়া যায়। অতিরিক্ত ভোগের দ্বারা তৃপ্ত চরিতার্থ হইলে রিপুর বেগ কমিয়া যায়, তাহা নিস্তেজ হইয়া পড়ে; তখন প্রতিক্রিয়ার ফলে কিছু কালের জন্য তাহার বিপরীত গুণ বা প্রেরণা সেখানে স্থান পায়। যোগী ঠিক সেই শুভ মুহূর্ত্তে যদি নিগ্রহ অবলম্বন করেন এবং এই রকম সুযোগ ধরিয়া বার বার নিগ্রহ অভ্যাস করেন তবে ক্রমে বৃত্তিটির জীবনীশক্তি এতখানি হ্রাস পায় যে শেষে সংযম প্রয়োগের সুবিধা তাঁহার হয়। এই যে ভোগ ও বৈরাগ্যের পন্থা, ইহাও প্রকৃতির ক্রিয়াবলীর একটা সাধারণ ধর্ম্ম; কিন্তু শুধু এইটিকেই ধরিয়া চলিলে কার্য্যসিদ্ধি হয় না। বিশেষত যে-সকল বৃত্তি সনাতন বা স্থায়ী

সে-গুলির উপর ইহার প্রয়োগ করিলে দোলাচল বৃত্তির সৃষ্টি হয় মাত্র, অর্থাৎ একবার বৃত্তিটি আবার তাহার বিপরীত বৃত্তি পর্য্যায় ক্রমে ঘুরিয়া ঘুরিয়া আসিতে থাকে, তাহাদের শেষ কখন হয় না। অবশ্য এই ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার চিরন্তন খেলা প্রকৃতির কাজের পক্ষে বিশেষ উপযোগী, কিন্তু মানুষের পক্ষে আত্মজয়েব দিক হইতে ইহার কোন অর্থ নাই, কোন মীমাংসায় ইহার দ্বারা পৌঁছান যায় না। এই উপায়টির সাথে সাথে যদি সংযমের ব্যবহার করা যায়, তবেই সম্যক ফল পাওয়া যায়। যোগী বৃত্তিকে দেখেন প্রকৃতির অঙ্গ হিসাবে, তাহার সহিত তাঁহার নিজের কোন সম্বন্ধ নাই, তিনি শুধু দ্রষ্টা ; কাম হউক, ক্রোধ হউক, কিছুই তাঁহার নিজের নয়, সবই মাতৃরূপিণী শক্তির, শক্তিই আপন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বৃত্তিকে জাগাইতেছেন আবার শান্ত করিয়া ধরিতেছেন। অবশ্য বৃত্তিটি যখন সবল সতেজ অক্ষত, তাহার আধিপত্য যখন অটুট, তখন সত্য সত্য এই রকম ভাব রাখা যায় না ; প্রাণে অনুভব না করিয়া শুধু চিন্তায় ধারণা করিবার চেষ্টা হইতেছে "মিথ্যাচার", অসত্য আচরণ বা আত্ম-প্রবঞ্চনা। পুনঃ পুনঃ ভোগের ও নিগ্রহের দ্বারা যখন একটা বৃত্তি কথঞ্চিৎ নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে তখনই কেবল প্রকৃতি তাহাব নিজের সৃষ্টিকে পুরুষের আজ্ঞা অনুসারে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে। এই নিয়ন্ত্রণের প্রথম ধাপ হইতেছে বৈরাগ্য—যে বৈরাগ্যের অর্থ দারুণ ঘৃণা। এত উগ্র একটা আবেগ অবশ্য কখন স্থায়ী হইতে পারে না, তবুও সেই আবেগের ভিতরে ভিতরে

রহিয়াছে তাহার কারণটিকে উচ্ছেদ করিবার যে-ইচ্ছা, তাহাই স্থায়ী লাভ ; এমন কি রিপুটি ফিরিয়া যখন আবার রাজত্ব করিতে থাকে তখনও সে ইচ্ছা একেবারে লোপ পায় না। তারপরের ধাপে রিপুর প্রত্যাবর্ত্তন একটা অস্বস্তি আনিয়া দেয় বটে, কিন্তু তাহা অসহ্য কিছু বলিয়া বোধ হয় না। শেষের ধাপ হইতেছে পরম নির্ব্বিকার ভাব, উদাসীনতা। তখন সাধক শুধু দেখিয়া যান কি রকমে প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মের বশেই বৃত্তিটি আস্তে আস্তে দূর হইয়া যাইতেছে। তখনই সাধক হইতেছেন প্রকৃত সংযমী, কারণ এই জ্ঞান তাঁহার তখন হইয়াছে যে তিনি দ্রষ্টা পুরুষ, তিনি যদি কোন বৃত্তি হইতে আপনাকে পৃথক করিয়া ধরেন তবে সে-বৃত্তি আপনা হইতেই স্তব্ধ হইয়া যাইবে। পরিণামে লাভ হয় মুক্তি—মুক্তি অর্থ লয় বা নির্ব্বাণ হইতে পারে অর্থাৎ বৃত্তি যেখানে চিরকালের জন্য নিঃশেষ লোপ পাইয়াছে। অথবা মুক্তি অর্থ হইতে পারে জীবের সেই অবস্থা যখন সৃষ্টিকে ভগবানের লীলা বলিয়া তাহার জ্ঞান হয়, এবং কোন বৃত্তি ভগবান ফেলিয়া দিবেন অথবা আপন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য রাখিয়া দিবেন তাহাও ভগবানেরই উপর সে ছাড়িয়া দেয়। এই শেষের পথটিই কর্ম্মযোগীর। কর্ম্মযোগী ভগবানের হাতে আপনাকে তুলিয়া দেয়, কর্ম্ম করে তাঁহারই জন্য, কারণ সে জানে যে তাহার ভিতর দিয়া ভগবানের শক্তিই কর্ম্ম করিতেছে। এই আত্ম-সমর্পণের ফলে, ভগবান সকল ভার স্বয়ং গ্রহণ করেন ; গীতায় তিনি যে-কথা দিয়াছেন তদনুসারে, তাঁহার

সে সকল ভক্তকে সকল পাপ হইতে অশুদ্ধতা হইতে মুক্ত করিয়া দেন। বৃত্তিগুলি তখন কাজ করে কেবল শারীর যন্ত্রকে আশ্রয় করিয়া, অন্তর-পুরুষকে স্পর্শ করে না, আর কাজ করিবার জন্য দেখা দেয় শুধু যখন আপন উদ্দেশ্যের জন্য ভগবান তাহাদিগকে ডাক দেন। ইহারই নাম নির্লিপ্ততা, লীলারই মধ্যে থাকিয়া পরম মুক্তিলাভ।

ব্যষ্টির পক্ষে যে-বিধান, গোষ্ঠীর পক্ষেও সেই একই বিধান। যাঁহাদের একটা সূক্ষ্ম দৃষ্টি আছে তাঁহারা দেখিয়াছেন ও বলিয়া গিয়াছেন যে মানব-সমাজে ক্রমোন্নতির ধারা হইতেছে মানুষের মধ্যে শ্বাপদের ও বন্য মানবের প্রকৃতিকে ক্ষয় করিয়া করিয়া উঠিয়া চলা। এক সময় ছিল যখন মানুষের সমাজে নিষ্ঠুরতা, লাম্পট্য, ধ্বংসলিপ্সা, উৎপীড়ন, নির্ব্বুদ্ধিতা, পাশবিকতা, ঘোর অজ্ঞান অপ্রতিহত প্রভাবে রাজত্ব করিত। তারপর এই অতি-ভোগের ফলে যখন একটা বিতৃষ্ণা ও অনিচ্ছা জন্মাইল তখন ধর্ম্মের ও দানের উৎকর্ষের সাথে সাথে এই সব বৃত্তিগুলিকে কতক শুদ্ধতর বৃত্তিতে পরিবর্ত্তিত করিয়া লইবার, কতক বা দমন করিয়া রাখিবার একটা প্রয়াস আসিল। ইউরোপে খৃষ্টিয় যুগের গোড়া পত্তন অনেকটা এইভাবেই হয়। কিন্তু এ-পথের যে-নিয়ম বা ধর্ম্ম তাহার ব্যত্যয় এখানেও হয় নাই। বৃত্তিগুলি কিছুকালের জন্য সুপ্ত বা সংযত থাকিয়া বারে বারে ন্যূনাধিক পরিমাণে আবার উঠিয়া দেখা দিয়াছে, এবং কমবেশি আপনাদের আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে। ক্রমে যখন ঊনবিংশ শতাব্দী আসিল তখন

মনে হইল, এই সকল প্রাকৃত শক্তির কতকগুলি অন্ততঃ তৎসময়ের জন্য যেন ক্ষয় পাইয়া গিয়াছে, যেন সংযমের, প্রকৃতির ক্রমোন্নতির পথ হইতে তাহাদের সম্পূর্ণ নিরাকরণের সময় আসিয়াছে। এই রকমের আশা অনেকবারই হয় এবং পরিণামে আশা পূর্ণও হয় বটে, কিন্তু তৎপূর্ব্বে একটা শেষ ধাক্কা আবার দেখা দেয়। মানুষ যে আবার পাশব স্তরের মধ্যে নামিয়া পড়িতেছে তাহার নিদর্শন আজকাল খুবই স্পষ্ট—বিশেষতঃ ইউরোপে ও আমেরিকায়,—বিজ্ঞান, শিক্ষাদীক্ষা, সভ্যতা, বিশ্বমৈত্রী প্রভৃতি বাহিরের মনোহর সাজ-সজ্জার পিছনে দানবেরই জন্ম হইতেছে; আর আজ যে দুর্লক্ষণ সব দেখিতেছি তাহার অপেক্ষা আরও অনেক দুর্লক্ষণ অব্যবহিত ভবিষ্যতে ঘনাইয়া আসিতেছে।*

আমরা যে নিয়মের কথা বলিলাম তাহার ক্রিয়া মানুষের সমাজে ও রাষ্ট্রনীতিক ক্ষেত্রেও দেখিতে পাওয়া যায়। মানবজাতির মধ্যে রাষ্ট্রনীতিক ক্রমোন্নতি কতকগুলি বিশেষ ধারায় চলিয়াছে। তাহাদের আধুনিকতম রূপের সূত্রটি ফরাসী বিপ্লব কয়েকটি কথায় বাঁধিয়া দিয়াছে—স্বাধীনতা, সাম্য, সৌভ্রাত্র্য। কিন্তু পুরাতন জগতের শক্তি সব,—প্রভুত্বের অত্যাচার, জন্মগত অধিকারের আধিপত্য, স্বার্থের জন্য কলহ ও রেষারেষি, নিজের লাভের জন্য অপরকে শোষণ, ইত্যাদি সমস্তই সদাসর্ব্বদা পৃথিবীর রাজতক্তে আপন আসন পাতিবার জন্য বিপুল চেষ্টা

* কথা কয়টি ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের চারি বৎসর পূর্ব্বে লেখা হইয়াছিল।

করিতেছে। বহুদেশেই তাই আজকাল বিপরীত দিকে একটা গতি স্পষ্টই লক্ষ্য করা যায়। যে-ইংলণ্ড একদিন সকলের উন্নতি ও স্বাধীনতাই তাহার আদর্শ বলিয়া মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিল, ঠিক সেইখানেই বোধ হয় প্রতিক্রিয়ার শক্তি সর্ব্বাপেক্ষা বলীয়ান। তবে পুরাতন সংস্কারকে সম্পূর্ণরূপে ধুইয়া মুছিয়া দিতে হইলে আগে এই রকমেই অব্যর্থভাবে ক্ষয় করিয়া আনিতে হয়। এই জন্যই বারে বারে তাহার মধ্যে ফিরিয়া যাইয়া তাহার ভোগ শেষ করিতে হয়। পুনঃ পুনঃ তাহা মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়, পুনঃ পুনঃ ভাঙ্গিয়া ধ্বসিয়া পড়িবার জন্যই। অন্য দিকে, সাম্যের গণশক্তির প্রেরণায় এখনও ক্ষয় ধরে নাই, এখনও তাহা পূর্ণ পরিণত হইয়া উঠে নাই, তাহার ভোগের কাল বেশি অতিবাহিত হয় নাই, এখনও তাহা সতেজ, অতৃপ্ত, সার্থকতাপ্রয়াসী। অতীতে এই তরুণ শক্তিকে যতবার দমন করিবার চেষ্টা হইযাছে ততবারই পরিণামে তাহাতে দমনকারী শক্তিই পর্য্যুদস্ত হইয়া গিয়াছে; গণতন্ত্রের শক্তি তাহাতে আরও ক্রুদ্ধ বুভুক্ষিত অসহিষ্ণু হইযা উঠিয়াছে,—"সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা" তাহার এই কল্যাণকর মন্ত্রের শেষে জুড়িয়া দিয়াছে, "নতুবা মৃত্যু।" অবশ্য স্বাধীনতার সেবক যে প্রত্যেকের স্বেচ্ছাচারের স্বাধীনতা চাহিতেছেন (এনার্কিজম্), সাম্যের সাধক যে সকলকে একই ছাঁচে ঢালিয়া একাকার করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেছেন (সোসিয়ালিজম), অথবা সৌভ্রাত্র্যপ্রয়াসী যে জগৎ-জোড়া কর্ম্মীসঙ্ঘ (কমিউনিজম) গড়িয়া তুলিতে

চাহিতেছেন—গণতান্ত্রিক প্রেরণার এই সব চরম স্বপ্ন অব্যবহিত ভবিষ্যতে—কিছু ফলিবে না। কিন্তু এই বৃহৎ আদর্শ একটা কিছু সমন্বয় অদূর ভবিষ্যতে সৃষ্টি করিবেই। প্রাচীন জগতের শক্তি যে প্রভুত্বের অত্যাচার, যে অসাম্য, যে অবাধ প্রতিযোগিতা, তাহারা আবার যখন একবার ভূতলশায়ী হইয়া পড়িবে, তখন তাহাদের সংযমের ক্রিয়া আরম্ভ হইবে। এই সংযমের পথে আমরা দেখিব, আর তাহাদের সে-প্রাণ নাই, অতীতের প্রেতমূর্তি তাহারা দেখিতে দেখিতে মিলাইয়া যাইতেছে; তখন কোন রকম জোর করিয়া নিগ্রহ করিবার প্রয়োজন কিছু থাকিবে না, তাহারা নিজেরাই ধীরে ধীরে অথচ অব্যর্থভাবে প্রকৃতির লীলাক্ষেত্র হইতে লোপ পাইয়া যাইবে।

শান্তির শক্তি

জগতে দুইটি মহা শক্তি আছে—এক, বাক্ আর এক নীরবতা। নীরবতা প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করে, বাক্ গড়িয়া তোলে। নীরবতাই কাজ করিয়া চলে, বাক্ দেয় কর্ম্মের প্রেরণা। বাক্ করিতেছে অনুরোধ, নীরবতা দিতেছে আদেশ। বাহিরে চারিদিকে ভ্রম-প্রমাদের উচ্ছ্বসিত কোলাহল, ভিতরে আচ্ছন্ন রহিয়াছে একটা গভীর গম্ভীর শান্তি—ইহারই অন্তরে বিশ্বের যাবতীয় বিরাট গোপন কর্ম্মধারা আপনাকে পুষ্ট পরিণত করিয়া তুলিতেছে। উপরে যেন অগণিত বীচিমালার বিক্ষোভ, আর নিম্নে মহাসাগরের অদম্য অতল জলভার। মানুষ চোখে দেখিতেছে শুধু তরঙ্গমালা, তাহাদের সহস্র রকমের ধ্বনি শুনিতেছে; এই সকল দিয়াই সে ভবিষ্যতের গতি, ভগবানের নিগূঢ় অভিপ্রায় নির্ণয় করিতে চাহে—কিন্তু দশবারের মধ্যে একবারও এইভাবে তাহার সিদ্ধান্ত সঠিক হয় কি না সন্দেহ। এই জন্যেই বলা হয়, ইতিহাসে যাহা অপ্রত্যাশিত তাহাই সকল সময়ে ঘটিয়া থাকে। কিন্তু মানুষ যদি বাহিরের খোলসের উপর চক্ষু না বুলাইয়া ভিতরের বস্তুর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে পারিত, যদি দৃশ্যমান রূপ সরাইয়া দিয়া তাহার অন্তর্নিহিত স্বরূপের গুপ্ত সন্ধান লইত, যদি জীবনের কোলাহলে কান না

দিয়া এবং তাহার নীরবতা শুনিতে পাইত, তবে অপ্রত্যাশিত বলিয়া মানুষের কাছে কিছুই থাকিত না।

শ্বাস রোধ করিয়াই তবে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রমসাধ্য যত কাজ করিতে হয়। শ্বাস যত দ্রুত চলে, শক্তির অপচয়ও ততই ঘটে। কর্ম্মের সময় যে বিনা আয়াসে স্বতঃই শ্বাস বন্ধ করিয়া রাখিতে পারে, সেই প্রাণশক্তিকে বশীভূত করিয়াছে—এই প্রাণশক্তি হইতেছে সেই মূলশক্তি যাহা ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া সর্ব্বদা কর্ম্ম করিতেছে, সৃষ্টি করিতেছে। যোগীমাত্রেরই উপলব্ধি আছে যে, চিন্তা-স্রোত বন্ধ হইলে শ্বাসও নিরুদ্ধ হইয়া যায়—হঠযোগী ভীষণ যত্নে, বিপুল চেষ্টায় যে কুম্ভকের সাধনা করেন, এখানে আপনা হইতেই অবলীলাক্রমে তাহা অধিকৃত হয়; আবার চিন্তার স্রোত আরম্ভ হইলেই শ্বাসের ক্রিয়াও সুরু হয়। কিন্তু নিশ্বাস ও প্রশ্বাস না আরম্ভ হইলেও চিন্তার ধারা যদি চলিতে থাকে, তবেই বলা যায় প্রকৃত পক্ষে প্রাণকে জয় করা হইয়াছে। এখানেও পাই প্রকৃতির একটি নিয়ম। আমরা যখন চেষ্টা করিয়া কাজ করি, তখন প্রকৃতির শক্তিরাজীই যথেচ্ছ আমাদিগকে লইয়া চলে; আমরা যখন শান্ত সমাহিত থাকি তখন আমরাই হই প্রকৃতির ঈশ্বর। তবে শান্তি দুই রকমের—এক হইতেছে জড়ভাব শান্তি, তাহার অর্থ মৃত্যুর আরম্ভ; আর এক শান্তি আসিতেছে ঊর্দ্ধ-প্রতিষ্ঠ অটল প্রভুত্ব হইতে, তাহা জীবনকে অটুট সামঞ্জস্যে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। এই ঊর্দ্ধ-প্রতিষ্ঠ শান্তিই যোগীর শান্তি। শান্তি যতই পূর্ণতর

হয়, যোগশক্তিও ততই দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠে, কর্ম্মের তেজ ততই প্রবল হইয়া দেখা দেয়।

এই শান্তির মধ্যেই আবির্ভূত হয় সত্য জ্ঞান। মানুষের চিন্তা সত্য-মিথ্যার গ্রন্থি। সত্য অনুভব মিথ্যা অনুভবের দ্বারা কলুষিত আচ্ছাদিত, সত্য সিদ্ধান্ত মিথ্যা সিদ্ধান্তের দ্বারা খণ্ডিত, সত্য কল্পনা মিথ্যা কল্পনার দ্বারা বিকৃত, সত্য স্মৃতি মিথ্যা স্মৃতির দ্বারা প্রতারিত। মনের ক্রিয়া বন্ধ হইবে, চিত্ত বিশুদ্ধ হইবে, প্রকৃতির বিক্ষোভের উপর শান্তি নামিয়া আসিবে, তবে সেই শান্তির সেই শুদ্ধতার মধ্যে মনে আলো ফুটিয়া উঠিতে থাকিবে, ভ্রম-প্রমাদ ঘুচিয়া যাইতে থাকিবে; যে পর্য্যন্ত বাসনার তরঙ্গ না দেখা দিবে, সে পর্য্যন্ত চেতনার ঊর্দ্ধতর স্তরে একটা স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠিত হইবে, ঊর্দ্ধতর স্তরের এই স্বচ্ছতাই আবার নিম্নতর স্তরে শান্তিকে আনন্দকে অব্যর্থভাবে ডাকিয়া আনিবে। সত্য জ্ঞানই তখন হইবে সত্য কর্ম্মের উৎস।

যোগীর জ্ঞান বাসনা-তাড়িত সাধারণ মনের দেওয়া জ্ঞান নয়; আবার বিচার-বিতর্কের বা লৌকিক বুদ্ধির দ্বারা লভ্য যে জ্ঞান বাহিরের বস্তু বা ঘটনার উপরই একান্তভাবে প্রতিষ্ঠিত অথবা যাহা শুধু অভিজ্ঞতা ও সম্ভাব্যকে আশ্রয় করিয়া চলি- যাছে তাহাও যোগীর জ্ঞান নয়। যোগী জানে ভগবান কি ভাবে কর্ম্ম করিয়া চলেন, তিনি দেখিয়াছেন অসম্ভবও অনেক সময়ে সম্ভব হয়, বাহিরের বস্তু বা ঘটনা ভুল পথে লইয়া চলে। তিনি বুদ্ধির উপরে সাক্ষাৎ জ্ঞানের জ্যোতির্ম্ময় প্রতিষ্ঠানে

উঠিয়া গিয়াছেন—যাহার নাম আমরা দিয়াছি "বিজ্ঞান"। বাসনা-তাড়িত মন ভাল ও মন্দ, সুখ ও দুঃখ, প্রিয় ও অপ্রিয় লইয়া যে জটিল জাল তাহার মধ্যে বিজড়িত—আবদ্ধ। সে চায় শুধুই ভাল, শুধুই সুখ, শুধুই সৌভাগ্য। সৌভাগ্যে সে উল্লসিত হইয়া উঠে, তদ্বিপরীতে চঞ্চল বিমূঢ় হইয়া পড়ে। কিন্তু সাক্ষাৎ জ্ঞানের দৃষ্টি দেখিতেছে, জগতে যাহা কিছু সবই কল্যাণের জন্য—কারণ ভগবান সবই, আর তিনি "সর্ব্ব-মঙ্গলং"। এই দৃষ্টি যে পাইয়াছে সে জানে অনেক সময়ে মন্দের ভিতর দিয়াই থাকে ভালতে পৌঁছিবার সব চেয়ে সোজা রাস্তা, সুখের সৃষ্টির জন্যই অব্যর্থভাবে প্রয়োজন হয় দুঃখের আবির্ভাব, প্রিয়তর অবস্থা লাভ করিতে হইলে আগে অপ্রিয়ের আস্বাদ দরকার হয়। এই সকল দ্বন্দ্বের দাসত্ব হইতে যোগীর বুদ্ধি মুক্তিলাভ করিয়াছে।

সুতরাং যোগীর কর্ম্ম সাধারণ মানুষের কর্ম্মের মত হইতে পারে না। তাঁহাকে দেখিয়া অনেক সময়ে মনে হইতে পারে, তিনি যেন পাপকর্ম্মে অনুমতি দিতেছেন, দুঃখ-দারিদ্র্য মোচনের সকল প্রকার চেষ্টা এড়াইযাই চলিয়াছেন, অত্যাচারের উৎ-পীড়নের বিরুদ্ধে যে-সব বীর-হৃদয় দাঁড়াইয়াছে তাহাদের প্রতি কোন সহানুভূতি দেখাইতেছেন না; যেন তিনি পিশাচবৎ। অথবা লোকে তাঁহাকে জড় বলিয়া মনে করিতে পারে—যেন কাঠ-পাথরের মত নিথর নিশ্চল; কারণ যেখানে কাজ করা উচিত, সেখানে তিনি নির্ব্বিকার হইয়া বসিয়া রহিয়াছেন,

যেখানে মানুষ চাহে মুখ ফুটিয়া কথা কহা সেখানে তিনি নির্ব্বাক, যেখানে হৃদয়ের গভীর আবেগ উত্তেজনা আশা করে সে ক্ষেত্রে তিনি অবিচলিত। আবার যখন তিনি কোন কাজ করেন, তখন মানুষ হয়ত তাহাকে বলিবে উন্মত্ত—পাগল, অপ্রকৃতিস্থ, নির্ব্বুদ্ধি; কারণ অনেক সময়ে দেখা যায় তাঁহার কাজের কোন বিশেষ ফল বা উদ্দেশ্য যেন নাই, তাহাতে কোন শৃঙ্খলা, কোন অর্থ, সম্ভব অসম্ভব কোন বিচার যে আছে এমন বোধই হয় না, কিম্বা সে কাজ এমন লক্ষ্যে এমন উদ্দেশ্যে করা হইতেছে ইহজগতে যাহার কোন প্রয়োজন বা সার্থকতা কিছুই নাই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, তিনি যে আলোক অনুসরণ করিয়া চলেন, তাহা সাধারণের আয়ত্তে নাই—সাধারণে তাহাকে অন্ধকারই নাম দিবে, আর সকলের কাছে যাহা স্বপ্ন, তাঁহার কাছে তাই জাগ্রত, তাঁহার দিন আর সকলের রাত্রি। যোগীর আর সাধারণের পার্থক্যই ঠিক এইখানে—সাধারণে বিচার করিয়া জানে, তিনি সাক্ষাৎ দেখিয়া জানেন।

নিজেকে শান্ত করিবার, নিস্তব্ধ করিবার, উদ্ভাসিত মনে নির্ব্বিকার হইয়া থাকিবার সামর্থ্য যাহার আছে, সেই অমৃতত্বের অধিকারী—অমৃতত্বায় কল্পতে। আমাদের প্রাচীন শিক্ষা-দীক্ষার আদর্শ ছিল "ধীর" হওয়া, কিন্তু তাহার অর্থ নয় তামসিক হওয়া, জড় পদার্থ হইয়া পড়া। তামসিক মানুষের নৈষ্কর্ম্ম্য চারিদিকের শক্তিরাজীর পথে বৃহৎ বাধা; কিন্তু যোগীর নৈষ্কর্ম্ম্য সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারী। যোগীর ক্রিয়াশক্তি প্রাকৃতিক

শক্তির মতই ঋজু, বিপুল, বিরাট। যোগীর অন্তরে যে-স্তব্ধতা, অনেক সময়ে তাহা বাহিরে কথাবার্ত্তা বা ক্রিয়া-কলাপের আবরণে আচ্ছাদিত থাকে—তবে এ যেন গভীর মহাসাগর উপরে উপরে তরঙ্গ-সমাকুল হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু মানুষ ভগবানের সত্যকার কর্ম্মধারা দেখিতে পায় না, মানুষের দৃষ্টি আবদ্ধ স্থূলের কলকলায়িত ঘটনা-স্রোতের মধ্যে—স্থূলের এই আবরণ ভেদ করিয়া ভিতরের সত্য সে ধরিতে পারে না। ঠিক সেই রকমে যোগীর কর্ম্মধারাও মানুষে বুঝিতে পারে না, কারণ যোগী বাহিরে এক, ভিতরে আর। কোলাহলের কর্ম্মের শক্তি বিপুল, সন্দেহ নাই-জেরিকো নগরীর দেউল শব্দের সংঘাতেই না ধ্বসিয়া পড়িয়াছিল? কিন্তু স্তব্ধতার নীরবতার শক্তি অসীম—কারণ বাহিরের কর্ম্মে প্রকাশ পাইবার পূর্ব্বে তাহারই অন্তরে সকল বৃহৎ শক্তি আপনাকে প্রস্তুত করিয়া লইতেছে।

পুরুষত্রয়

মানুষের চিন্তা যত রকম তত্ত্ব-সমস্যার মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিয়াছে তাহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দুরূহ হইতেছে এইটি—জাগতিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যে চৈতন্যময় সত্তা তাহার স্বরূপ কি, তাহার সহিত আমাদের সম্বন্ধই বা কি? চৈতন্যবাদী জাগতিক প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন, আর জড়বাদী চৈতন্যময় সত্তাকে অস্বীকার করেন। চৈতন্যবাদীর কাছে জগৎ হইতেছে অদ্বিতীয় সর্ব্বব্যাপী আত্মার যে জ্যোতির্ম্ময় শান্তি তাহার উপরে একখণ্ড ক্ষণিকের ছায়া। জড়বাদীর কাছে চৈতন্য হইতেছে জড়ের ক্রিয়ার একটা মানসিক বিকার। ছায়া কেন আছে তাহার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা চৈতন্যবাদী দিতে পারেন না; তিনি স্বীকারই করেন তাহা অনির্ব্বচনীয়, অস্তি এবং নাস্তিও। আবার জড়বাদীও চৈতন্য কেন আছে তাহার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে পারেন না; তিনি শুধু দেখান চৈতন্যের বিকাশ স্তরের পর স্তরে কি ভাবে হইল, তাহার কার্য্যপ্রণালী কিরূপ—পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্য্যবেক্ষণার বাহুল্য দিয়া তিনি ব্যাখ্যার অভাবটা ঢাকিয়া রাখিতে সচেষ্ট। কিন্তু মানুষের যে অন্তরাত্মা বাহিরের দিকে ভিতরের দিকে যুগপৎ দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া দিয়াছে, তাহাকে প্রাচ্যের শঙ্করও

তৃপ্ত করিতেছে না, পাশ্চাত্যের হীকেলও (Haeckel) তৃপ্ত করিতেছে না। তাহার দৃষ্টিতে জগতের সর্ব্বব্যাপী সত্তাও আছে, চৈতন্যের সর্ব্বব্যাপী সত্তাও আছে। সে খুঁজিতেছে এমন একটা সত্য যাহা উভয়কে স্বীকার করিতেছে, ধরিয়া আছে, এক করিয়া লইয়াছে—কোনটিকেই সে ফেলিয়া দিতে চাহে না, সে চাহে দুইএর সমন্বয়।

উপনিষদ জগতের অস্তিত্ব অস্বীকার করে না, তবে জগৎকে জগতাতীত ব্রহ্মের সহিত একীভূত করিয়া দেখে। ব্রহ্মই এক অদ্বিতীয়, ব্রহ্মই সব। সব যদি ব্রহ্মই হইল, তবে ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছু থাকিতে পারে না ; সুতরাং সকলের অস্তিত্ব—সর্ব্বমিদং—ব্রহ্মের একত্ব নষ্ট করে না, ভেদ বা পার্থ্যক্যের সৃষ্টি করে না। এ যেন একই চৈতন্যময় পুরুষ নানা কেন্দ্র হইতে আপনার উপর দৃষ্টিপাত করিতেছে, আর প্রত্যেক কেন্দ্রটি আর সকল কেন্দ্রের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন, তাহাদের আনন্দে আনন্দময়। ভাবের ও চিন্তার, কল্পনার ও উপলব্ধির, নাম ও রূপের, অনুভবের ও স্পন্দনের একটা অকূল স্রোত সম্মুখে অবিরল ছুটিয়া চলিয়াছে, তাহার আরম্ভ নাই শেষ নাই, কখনও ভাসিয়া উঠিতেছে কখনও আবার তলাইয়া অদৃশ্য হইতেছে ; তাহারই ভিতর দিয়া সেই এক চৈতন্যময় পুরুষ আপনার লক্ষ লক্ষ রূপ ব্যক্ত করিয়া বাহিরে ছড়াইয়া দিতেছেন—যেন অসংখ্য তরঙ্গসঙ্কুল এক মহাসাগর। একটা বিশেষ রূপ তাহার স্বরূপের তাহার মূলবস্তুর মধ্যে মিলাইয়া অদৃশ্য হইতে

পারে, কিন্তু তাহাতে ত বাহ্য জগতের অস্তিত্ব লোপ পায় না, পাইতে পারে না। এক হইতেছে সনাতন ; বহুও সনাতন,—এক যে সনাতন এই জন্যই। সাগর যতদিন, সাগরের তরঙ্গও ততদিন।

বিশ্ব-প্রকৃতির মহাসাগরে যত বিক্ষোভ যত পরিবর্ত্তন, তাহার অন্তরে স্থির-প্রতিষ্ঠ হইয়া আছেন অন্তরাত্মা বা পুরুষ, যিনি অটল অচঞ্চল অপরিবর্ত্তনীয় চিরন্তন—নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ম্ সনাতনঃ। সমষ্টির মধ্যে আছে একই পুরুষ—একাধিক নয়, একমাত্র পুরুষ বিশ্বের বিক্ষোভ ধারণ করিয়া আছেন। ব্যষ্টির মধ্যে এই পুরুষের আছে তিনটি রূপ, অভি-ব্যক্তির তিনটি ক্রম ; তিনি এক বটে, কিন্তু ত্রিধা-ভিন্ন, "ত্রিবৃৎ"। উপনিষদে একই বৃক্ষে দুইটি বিহঙ্গের কথা বলিয়াছে—তাহাদের একটি বৃক্ষের ফল আহার করিতেছে আর একটি উপরে এক শাখায় বসিয়া তাহার সাথীটিকে কেবল নিরীক্ষণ করিতেছে। একটি হইতেছে 'ঈশ' অর্থাৎ নিজেই নিজের প্রভু, আর একটি 'অনীশ' নিজে নিজের প্রভু নয়। ভোক্তা যে সে যখন উপরিস্থ দ্রষ্টার দিকে দৃষ্টিপাত করে, তাহার মহত্ত্ব অনুভব করে এবং তাহার সত্তায় আপনার সত্তা পরিপূর্ণ করিয়া ধরে তখন শোক মৃত্যু-বন্ধন—এক কথায় অজ্ঞান বা মায়া, ভোক্তা বিহঙ্গকে আর স্পর্শ করে না। দুই জন পুরুষ আছে, তাহাদের জন্ম নাই ; একটি স্ত্রী আছে, তাহারও জন্ম নাই। স্ত্রী হইতেছে মধুর ও তিক্ত ফল যাহার সেই বৃক্ষ ;

পুরুষ দুইটি বিহঙ্গদ্বয়। একটি পুরুষ স্ত্রীর মাধুর্য্য আস্বাদন করিতেছে, আর একটি তাহা হইতে দূরে রহিয়াছে। এই পুরুষদ্বয়ই হইতেছে অক্ষর পুরুষ ও ক্ষর পুরুষ, আর স্ত্রীটি হইতেছে প্রকৃতি। অক্ষর পুরুষ অর্থ যে পুরুষ বা আত্মার ক্ষয় নাই, পরিবর্ত্তন নাই; আর ক্ষর পুরুষ অর্থ যে পুরুষ বা আত্মার দেখা যায় ক্ষয় আছে, পরিবর্ত্তন আছে। প্রকৃতি অর্থ বিশ্বশক্তি, ইউরোপীয়েরা যাহাকে বলে Nature, "নেচার"। ক্ষর পুরুষ হইতেছে প্রকৃতির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত আত্মা, সে প্রকৃতি হইতে আনন্দ ভোগ করে; অক্ষর পুরুষ প্রকৃতির উপরে দাঁড়াইয়া, সে শুধু প্রকৃতির লীলা নিরীক্ষণ করিয়া যায়। কিন্তু আর একজন আছেন, যিনি বৃক্ষে উপবিষ্ট নহেন, তিনি বৃক্ষটি ব্যাপিয়া অধিকার করিয়া আছেন, তিনি শুধু নিজেই নিজের কর্ত্তা নহেন, তিনি আবার যাহা কিছু আছে সমস্তেরই কর্ত্তা। তিনি ক্ষরের উপরে, অক্ষরেরও উপরে, তাঁহার নাম পুরুষোত্তম—যে আত্মা ভগবানের সহিত বিশ্বের সহিত একীভূত—

এই পুরুষত্রয়ের কথা গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ে বিধৃত হইয়াছে। সেখানে বলা হইয়াছে:—

"সৃষ্টির মধ্যে দুইটি পুরুষ আছে, একটি ক্ষর আর একটি অক্ষর; ক্ষর হইতেছে জীব সকল, আর অক্ষর হইতেছে কূটস্থ অর্থাৎ চূড়ায় যিনি আসীন। আর এক পুরুষ আছেন যিনি উত্তম অর্থাৎ সকলের উপরে, যাঁহার নাম দেওয়া হয় পরমাত্মা— এই পরম আত্মাই লোকত্রয়ের (সুষুপ্তি, স্বপ্ন ও জাগ্রত—অর্থাৎ

কারণ, মানস ও স্থূল প্রতিষ্ঠান) মধ্যে প্রবেশ করিয়া আছেন, তাহাদের অক্ষয় ঈশ্বর হইয়া তাহাদিগকে ভরণ করিতেছেন।"

ত্রয়োদশ অধ্যায়ে, উপরের (পরা) প্রকৃতি ও নীচের (অপরা) প্রকৃতির পার্থক্য দেখাইতে গিয়া শ্রীকৃষ্ণ আরও সূক্ষ্মভাবে প্রকৃতির সহিত ভগবানের ও জীবের সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়াছেন :—

"প্রকৃতি হইতেছে কার্য্য, কারণ ও কর্ত্তৃত্বের হেতু; আর পুরুষ হইতেছে সুখ, দুঃখ ও ভোক্তৃত্বের হেতু। প্রকৃতির মধ্যে অধিষ্ঠিত যে পুরুষ তিনিই প্রকৃতির সৃষ্ট গুণত্রয়ের ক্রিয়াবলী উপভোগ করেন।* উৎকৃষ্ট কি নিকৃষ্ট দেহে জন্ম লইবার কারণ হইতেছে গুণের উপর পুরুষের আসক্তি। আর যিনি কেবল দেখিয়া যাইতেছেন, অনুমতি দিতেছেন, ধারণ করিয়া আছেন, ভোগ করিতেছেন, যিনি মহান্ ঈশ্বর তাঁহারই নাম পরমাত্মা, পুরুষোত্তম।"

এই শ্রেষ্ঠতম পুরুষ কোন ব্যক্তিবিশেষ নহেন, তাঁহার ব্যক্তিত্ব বিশ্বব্যাপী। জীবের মধ্যে যাহা কিছু আছে—স্বভাব, ভাব, কল্পনা, উপলব্ধি, ইন্দ্রিয়ানুভব বা গতি—তৎসমস্ত তাঁহার মধ্যে স্থান পাইয়াছে, কিন্তু অধ্যাত্ম রসানুভূতির বিষয় রূপে; যে সকল দ্বারা তাঁহাকে পরিমাপ করা যায় না, তাঁহাকে

* গুণ হইতেছে প্রকৃতির মূলধর্ম্ম বা ক্রিয়ার ধারা। তিনটি গুণের বিভিন্ন রূপ হইতেছে—সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়; গ্রহণ, বর্জ্জন ও স্তম্ভন; জ্ঞান, মিথ্যা-জ্ঞান ও অজ্ঞান; শান্তি, ক্রিয়া ও জড়ত্ব।

সীমানাবদ্ধও করা যায় না। তিনি যুগপৎ সকল জিনিষ। এই ধরণের একটি বিশ্বসত্তার প্রয়োজন হয় ব্যষ্টিসত্তার সৃষ্টি ও স্থিতির জন্য; কিন্তু ব্যষ্টিসত্তার যে সীমা বা গণ্ডী তাহা সে বিশ্বসত্তায় থাকিতে পারে না। বিশ্বসত্তাকে লীলার জন্য ভিতরে কিছু জমা রাখিতে হয়, আর কিছু বাহির করিয়া দিতে হয়—এই আংশিক প্রকাশই হইতেছে জীব। "ব্যষ্টিসত্তা লইয়া যে জগৎ তাহার মধ্যে আমারই সনাতন একটা অংশ জীব হইয়া দেখা দিয়াছে।" জীব বা ব্যক্তি হইতেছে ক্ষর পুরুষ, তাহার আর উর্দ্ধতম পুরুষের মাঝখানে দাঁড়াইয়া অক্ষর পুরুষ সেই বৃক্ষের চূড়ায় যে বিহঙ্গ, আপন আনন্দে যিনি আনন্দিত, প্রকৃতির লীলাখেলায় অবিচলিত, প্রকৃতির তিনি দ্রষ্টামাত্র, কেবল তাহার প্রতিচ্ছায়া আপন প্রশান্ত নিশ্চল সত্তার উপরে গ্রহণ করিতেছেন, কিন্তু কখনও তাহার দ্বারা বদ্ধও হন না, বিকৃতও হন না, তিনি আপনার মধ্যে আপনি সম্পুটিত, নিত্য-মুক্ত। আমাদের সত্যকার আত্মা—ভগবানের সহিত আমাদের যে একত্ব, যাহা কিছু নশ্বর পরিবর্ত্তনশীল তাহা হইতে আমাদের যে অব্যভিচারী মুক্তি তাহা এই অক্ষর পুরুষ। এই অক্ষর পুরুষ যদি না থাকিত তবে জন্ম-মৃত্যু, সুখ-দুঃখ, পাপ-পুণ্যের বন্ধন হইতে আমাদের কোনই পরিত্রাণ ছিল না। পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গের মত বৃথাই আমরা লৌহশলাকার উপর মাথা কুটিয়া মরিতাম, বাহিরে কখন আসিতে পারিতাম না। জন্ম-মৃত্যু, সুখ-দুঃখ, পাপ-পুণ্য হইত চিরন্তন অকাট্য সত্য—জীবন-

খেলার শুধু সাময়িক বিধিরূপে তাহারা দেখা দিত না। ভগবানের খেলায় স্বাধীন ইচ্ছায় যোগদান করা অথবা ইচ্ছামত আবার তাহা হইতে বিরত হওয়া আর আমাদের সাধ্যায়ত্ত হইত না।—আমাদের অভিনয় করিয়া যাইতে হইত অবশ পুতুলের মত। অক্ষর পুরুষের সহিত আমাদের যে একত্ব তাহা যখন উপলব্ধি করি তখনই অজ্ঞান হইতে, বাসনা-বন্ধ হইতে, কর্ম্মের অব্যভিচারী বিধান হইতে আমাদের মুক্তি। কিন্তু অন্যদিকে, সাংখ্যদর্শনের কথা মত, অক্ষর পুরুষই যদি সর্ব্বেসর্ব্বা হইত, তবে অনুভূতি অভিজ্ঞার মধ্যে বৈচিত্র্যের কোন ভিত্তিই থাকিত না, বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব বলিয়া কিছু থাকিত না, প্রত্যেক ব্যষ্টিসত্তা প্রত্যেক ব্যষ্টিসত্তার সম্পূর্ণ অনুরূপ হইত, প্রকৃতির মধ্যে সকল জীবাত্মারই ক্রমোন্নতি বা অভিজ্ঞার ধারা হুবহু একই রকম হইয়া পড়িত। ক্ষর পুরুষই হইতেছেন নানা জীব—বিশ্ব-"স্বভাবের" অর্থাৎ চৈতন্যময়ী প্রকৃতির যে ধর্ম্ম তাহার একটা বিশেষ বিশেষ অংশ যখন বিশেষ বিশেষ জীবের সাথে সংশ্লিষ্ট হয় তখনই অভিজ্ঞায়, স্বভাবে, ক্রম-বিকাশে একটা নানাত্ব বা বৈচিত্র্য আসিয়া উপস্থিত হয়। এই জন্যই গীতায় বলা হইয়াছে—ভগবানেরই অংশ জীব হইয়া দেখা দিয়াছে। "স্বভাব" একবার স্থির হইলে আর তাহার পরিবর্ত্তন হয় না; তবে বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন অবস্থায়, বিভিন্ন কর্ম্মে, কর্ম্ম বা সাধনা উপযোগী বিভিন্ন শরীরে এই স্বভাব তাহার বিভিন্ন অংশ বা ধারা প্রকাশ করিয়া ধরে। এই জন্য

প্রকৃতির মধ্যে রহিয়াছে যে পুরুষ তাঁহাকে বলা হয় ক্ষর অর্থাৎ তরল, পরিবর্ত্তনশীল—বাস্তবিক কিন্তু পুরুষ তরলও নয়, পরিবর্ত্তনশীলও নয়,—তাহা নিত্য, শাশ্বত, স্থানু, সনাতন। দেশ, কাল ও নিমিত্তের মধ্য দিয়া তাহার যে ভোগ-বৈচিত্র্য চলিয়াছে, তজ্জন্যই সে ক্ষর। অক্ষর পুরুষের আনন্দ আত্ম-প্রতিষ্ঠ, দেশ কাল নিমিত্তের অতীত, অক্ষর পুরুষ প্রকৃতির বহুল বিপুল অবিশ্রান্ত তরঙ্গ-বিক্ষোভ জানিতেছে, দেখিতেছে, কিন্তু নিজে অচঞ্চল। আর পুরুষোত্তমের আনন্দ প্রকৃতির মধ্যেও বটে, আবার প্রকৃতিকে ছাড়াইয়াও বটে—সকল অনুভব সকল আনন্দ আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে, সকল অনুভব সকল আনন্দের মূল সত্য হইতেছে পুরুষোত্তম।

জীবের ক্রমোন্নতি ক্ষর পুরুষই নির্দ্দেশ করিয়া থাকে, কিন্তু পরিচালিত করে না। প্রকৃতি বা বিশ্বশক্তি সে পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়াছে, কার্য্য-কারণের বিধান অনুসারে; প্রকৃতিই সত্যকার কর্ত্তা বা কার্য্যাধ্যক্ষ। জীবাত্মা কর্ত্তা নহে, তিনি যেন *মনিব প্রভু, তাঁহার কার্য্যাধ্যক্ষের--অর্থাৎ প্রকৃতির—কার্য্যের ফল-ভোক্তা তিনি। প্রকৃতিতে তিনি যখন আসক্ত হইয়া পড়েন, আপনাকে ভুলিয়া গিয়া প্রকৃতির সহিত নিজেকে এক করিয়া ফেলেন—তখনই তাঁহার এই ভুল ধারণা হয় যে তিনিই কর্ত্তা; এই মোহের ফলেই তিনি নিজের প্রভুত্ব ঈশ্বরত্ব হারাইয়া বসেন, দেশ-কালের মধ্যে, কার্য্য-কারণের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া পড়েন, তাঁহার নিজের অনুমতিতে যে-কাজ

হইতেছে তাহারই দাস হইয়া পড়েন। জীব ভগবানের অংশ, ভগবানেরই প্রতিরূপ; ভাগবত প্রকৃতিই তাহার প্রকৃতি। সুতরাং ভগবানও যাহা জীবও তাহা; তবে একটা সীমার মধ্যে, দেশ কাল নিমিত্তের প্রভাবের মধ্যে এই বন্ধন সে স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লইয়াছে। জীব হইতেছে দ্রষ্টা—জীব যদি দেখা বন্ধ করিয়া দেয়, তবে দৃশ্যও অদৃশ্য হইয়া যাইবে। জীব অনুমন্তা—সে যদি কোন জিনিষ প্রত্যাখ্যান করে তবে ক্রমোন্নতির ধারা হইতে তাহা খসিয়াই পড়িবে। ভোক্তা সে—তাই সে যদি উদাসীন হয়, তবে তাহাকে ধরিয়া যে ব্যক্তিগত ক্রম-বিকাশ তাহা স্থগিত হইয়া যাইবে। সে ভর্ত্তা—সে যদি ধারণ করিয়া না থাকে, ভরণ না করে, তবে আধার ধ্বসিয়া পড়িবে। জীবই প্রভু ঈশ্বর, তাহারই প্রীতির জন্য প্রকৃতি কাজ করিয়া চলিয়াছে। জীবই আত্মা—জড় তাহার আধার, তাহার পরিচ্ছদ, তাহার আত্মবিকাশের যন্ত্র। কিন্তু জীব-পুরুষ অনুমতি, প্রত্যাখ্যান বা আদেশ করিলেই তৎক্ষণাৎ—সেই স্থলে সেই মুহূর্ত্তে—যে কাজও হইয়া যায়, এমন নহে; কাজ হঠাৎ সরাসরি নিষ্পন্ন হয় না, তাহা হয় কালের অতিবাহনে, দেশের পরিবর্ত্তনে, কার্য্য-কারণের বিধান অনুসারে। সময় অল্প লাগিতে পারে, বেশী লাগিতে পারে, এক মুহূর্ত্ত, আবার বহু যুগ প্রয়োজন হইতে পারে; পরিবর্ত্তন সামান্য হইতে পারে অথবা বিপুল হইতে পারে—ইহলোকেই বা আর কোন লোকে তাহা ঘটিতে পারে; কাজের

ধারা ঋজুপথ লইতে পারে, কুটিল পথও লইতে পারে—সংক্ষিপ্ত উপায়ে, বিদ্যুৎগতিতে "ভৌতিক" ব্যাপারের মত তাহা চলিতে পারে, ক। ধীরে সুস্থে ক্রমগতির প্রত্যেক ধাপ দেখিয়া শুনিয়া, সজ্ঞান চেষ্টার সহায়ে তাহা অগ্রসর হইতে পারে। কিন্তু জীব যতদিন বদ্ধ ততদিন তাহার প্রভুত্ব তাহার রাজত্ব সীমাবদ্ধ—'আইন-অনুগত'—তাহা অবাধ স্বেচ্ছাচার হইতে পারে না। তাহার অনুমতি, তাহার পরোয়ানা প্রয়োজন হয় বটে, কিন্তু রাজ্যের কাজ করে যাহারা, যাহারা শাসন করে, ব্যবস্থা প্রণয়ন করে তাহারা হইতেছে দেহের মনের শক্তিরাজী লইয়া ঘটিত যে উচ্চতর পরিষৎ আর বাহিরের পারিপার্শ্বিক লইয়া ঘটিত যে নিম্নতর পরিষৎ।

মুক্তির পথে প্রথম পদক্ষেপ হইতেছে কর্ত্তৃত্বের অভিমান বিসর্জন দেওয়া, এই উপলব্ধি করা যে আত্মা কাজ করে না, কাজ করে প্রকৃতি। তার পর প্রয়োজন বাহিরের জগতের সহিত যত সম্বন্ধের সূত্র আমাদিগকে চতুর্দ্দিকে জালের মত ঘিরিয়া রহিয়াছে তাহা কাটিয়া ফেলা; এই জন্য প্রভুত্ব বা কর্ত্তৃত্ব অর্পণ করিতে হইবে ভগবানের উপর, নিজে স্বাধীন-ভাবে ভরণ করিবার অনুমতি দিবার প্রয়াস না করিয়া ভগবানের হাতে সে-সব ক্ষমতা তুলিয়া দিতে হইবে, তিনিই আবার আমার মধ্যে ভোক্তা হইয়া বসিবেন। আমার তখন থাকিবে শুধু অক্ষর পুরুষের ভাব অর্থাৎ আমি মুক্ত আনন্দময় সত্তা, প্রকৃতির ক্রিয়াবলীর দ্রষ্টা শুধু—অথচ আমি প্রকৃতির বাহিরে। ক্ষর

পুরুষত্রয়

পরুষ তখন অক্ষরের মধ্যে আপনাকে গুটাইয়া ধরিয়াছে। তারপর সাক্ষীও যখন ভগবানের মধ্যে আপনাকে গুটাইয়া লইবে তখনই পরমা মুক্তি।

প্রচ্ছন্ন পুরুষের আবেগ

জগৎ যেন একটা লুকোচুরি খেলা—বাহ্য রূপের পিছনে লুকাইয়াছে সত্য-বস্তু, জড়ের পিছনে আত্মা। বাহ্যরূপই সত্য-বস্তু বলিয়া আপনাকে চালাইতে চেষ্টা করিতেছে; আর সত্যবস্তুকে খুব অস্পষ্টভাবে দেখা যাইতেছে, মনে হয় সে যেন একটা বস্তুহীন ছায়ামাত্র। বাহ্য জগতের বিপুলত্ব, তাহার অকাট্য বিধান মানুষের কল্পনাকে শৃঙ্খলিত করিয়া ফেলিয়াছে। দেখিয়া দেখিয়া আমরা বলিয়া উঠি, "কি বিশাল এই যন্ত্র! কিন্তু কেমন আপনারই শক্তিতে তাহা চলিতেছে, কেহ তাহাকে পথ দেখাইতেছে না, কেহ তাহাকে গড়িয়া তোলে নাই! ব্রহ্মাণ্ডের গতিধারা শাশ্বত সনাতন।" আধখানা সত্য আমাদের দৃষ্টিকে অন্ধ করিয়া ফেলিয়াছে; আমরা দেখিতে পাইতেছি না যন্ত্রীহীন যন্ত্রের পরিবর্ত্তে আমাদের সম্মুখে বস্তুতঃ আছে শুধু একটা সত্তা—কোন যন্ত্রই এখানে নাই। ভগবান ও জগতের সম্বন্ধ ব্যক্ত করিতে গিয়া হিন্দুরা অনেক রকম রূপকেরই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু যন্ত্রের চিত্রটি তাহারা খুব বেশী ব্যবহার করে নাই। হিন্দুরা বলিয়াছে, উর্ণনাভ ও তাহার জালের কথা, অগ্নি ও তাহার বহুল স্ফুলিঙ্গের কথা, প্রত্যেক জলবিন্দু লবণাক্ত এমন সাগরের কথা।

জগৎটি জাগ্রত স্বপ্ন, মূর্ত্ত কল্পনা,—প্রত্যক্ষ শরীর সব আশ্রয় করিয়া সুবিন্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে এমন জ্ঞানরাশি; এই প্রত্যক্ষ শরীর এক একটি ভাবের বিগ্রহ, প্রত্যেক ভাব আবার একই অপরিবর্ত্তনীয় সত্যের অংশ। প্রত্যেক জিনিষই বিকাশ পায়, কিছুই নির্ম্মিত হয় না। যাহা অব্যক্ত থাকে, তাহাই ব্যক্ত হয়; কোন কিছু নূতন করিয়া তৈয়ার হয় না। যাহা আগে হইতে থাকে, তাহাই দেখা দেয়; যাহা কোন দিন ছিল না, তাহা কোন দিন হয়ও না। আবার যাহা আছে, তাহার ধ্বংস হয় না; শুধু তাহা আত্মহারা হইয়া যায়। সনাতন আত্মার মধ্যে সবই সনাতন।

চিরকাল ধরিয়া আছে কোন বস্তু? আত্মা। কে শুধু একাই আছে? আত্মা। কে চিরকাল থাকিবে? আত্মা। দেশে কালে যাহা কিছু আছে সবই তিনি, দেশ ও কাল ছাড়াইয়া যদি কিছু থাকে, তবে তাহাও তিনিই। এ কথার প্রমাণ? প্রমাণ এই সত্যটি, বহুর নিত্যপরিবর্ত্তনকে স্থায়িত্ব দিতেছে এক সনাতন অপরিবর্ত্তনীয় একত্ব। জড়ের যে মোট পরিমাণ অংশের নিত্য-পরিবর্ত্তনের সাথে সাথে, তাহাতে কোন হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না; মোট ক্রিয়াশক্তির সম্বন্ধেও সেই কথা; পুরুষের বা আত্মার সম্বন্ধেও সেই একই কথা। তরল অবস্থায় শক্তি তীব্রভাবে স্পন্দিত হইতে হইতে যখন রূপ লইয়া উঠিয়াছে তখনই তাহাকে বলি জড়; শক্তি হইতেছে আত্মার চৈতন্যে যে গতিধারা তাহার একটা পরিণাম। আত্মাই শক্তি, আত্মাই

কর্ম্মযোগীর আদর্শ

সৎ—জড় ও ক্রিয়াবল আত্মার গতিধারা। সৃষ্টির চিরন্তন সত্য, অন্তরতম বস্তু হইতেছে আনন্দের মধ্যে একীভূত সত্তা ও শক্তি—সচ্চিদানন্দম্। সে-শক্তি কিন্তু গতি নয়, তাহা 'জ্ঞান' বা 'চেতনা'। জ্ঞান গতিবেগের উৎস, গতিবেগ হইতে জ্ঞানের উৎপত্তি নহে। আত্মাই সুতরাং সব—চিন্ময় পুরুষই শুধু আছে। চেতনা বা শক্তি, সত্তা ও আনন্দ—তাঁহারই ত্রিধাভিন্ন প্রকাশ; সত্তা অর্থ চেতনা, চেতনা আবার শক্তি---শক্তি বা চেতনা অর্থ আবার আনন্দ।

আত্মা যেখানে বিজ্ঞানরূপে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছে তাহাই সৃষ্টির আরম্ভ বা বনিয়াদ। আত্মা যেখানে শুধু 'অস্তি' অর্থাৎ সৎ সেখানে সে এক; বিজ্ঞানরূপে সে এক থাকিয়াই আবার আপনাকে বহু করিয়া ধরে। ঐ যে বৃক্ষটি, উহা দেখিয়া আমরা বলি, "এই একটা স্থূল জিনিষ"; কিন্তু যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, জিনিষটি আসিল কোথা হইতে, তবে বলিতে হয়, বীজ হইতে উহা বাহির হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু "বাহির হইয়া আসা" অর্থ একটা প্রক্রিয়ার ক্রম-নির্দ্দেশ মাত্র—তাহাতে সেই প্রক্রিয়ার মূল হেতু বা উৎপত্তি কি তাহা ত বলা হইল না। বীজ হইতে গাছটি আসিল, আর কোন জিনিষ আসিল না কেন? উত্তর, বীজের ধর্ম্মই তাই। কিন্তু কেন এই ধর্ম্ম? আর কোন গাছ বা আর কোন জিনিষের জন্ম দেওয়া ঐ বীজের ধর্ম্ম হইল না কেন? উত্তর, এই রকম নিয়ম। কেন এই রকম নিয়ম? এ কথার উত্তর নাই, এই রকম হইয়া থাকে

তাই। ফলতঃ যখন আমরা বলি 'ধর্ম্ম' তখন তাহাতে বুঝি একটা ভাব ; যখন নিয়মের কথা বলি, তখন সে নিয়মও একটা ভাব। কোথাও ত একটা দৃঢ় বস্তু, একটা স্পষ্ট শক্তি বা প্রত্যক্ষ কর্ম্মবেগ কিছু মুঠার মধ্যে ধরিয়া বলিতে পারি না "এই পদার্থটি হইতেছে নিয়ম বা ধর্ম্ম"। বীজ হইতে বৃক্ষের উৎপত্তি, কারণ বৃক্ষটি ভাবরূপে বীজের মধ্যে নিহিত ; এখানে কিছু স্বষ্টি হইতেছে না, এখানে আছে একটা ক্রমপ্রকাশের, রূপগ্রহণের ধারা। পিছনে একটা ভাবের প্রেরণা যদি না থাকিত তবে জগৎটা কেবল বিশৃঙ্খল শক্তির অর্থশূন্য লীলা-ক্ষেত্র হইয়া পড়িত, তাহা নিয়মের ধর্ম্মের রাজ্য কখন হইত না ; আর একটা বিশেষ ভাবকে রূপ দিয়া প্রকাশ করিতেছে এমন চৈতন্য যদি কর্ত্তা হইয়া নিয়ন্তা হইয়া সেই ভাবের পিছনে না থাকিত, তবে বস্তুর ধর্ম্ম বলিয়াও কোন ভাব থাকিতে পারিত না। রূপের পরিবর্ত্তন হয়, তাহার জন্ম আছে—মৃত্যু আছে —চৈতন্যময় ভাব সনাতন। রূপ হইতেছে প্রকাশ, বাহ্য-শরীর, ভাব হইতেছে সত্য। রূপ ছায়ামাত্র, ভাবই প্রকৃত বস্তু।

সেই জন্যই হিন্দু মনীষীরা সকল পদার্থের মধ্যে দেখিয়াছেন নিগূঢ় আত্মার তপঃশক্তি। প্রজ্ঞা অর্থাৎ বিশ্বব্যাপী জ্ঞান-রূপে এই জিনিষটিই অচেতনের মধ্যে সচেতন, জড়ের মধ্যে সক্রিয়। প্রজ্ঞার ক্রিয়াশক্তিকেই পাশ্চাত্যেরা প্রকৃতি বা 'নেচার' (Nature) আখ্যা দিয়া থাকেন। গাছ নিজে

কিছু নিজের মূর্ত্তি গড়িয়া তোলে না, গাছটিকে রূপ দিয়া তুলিতেছে নিগূঢ় প্রজ্ঞার চাপ। প্রজ্ঞা মানুষের রেতবিন্দুর মধ্যে অধিষ্ঠিত, তাই এই জড়-অণু অনাগত শিশুটির প্রকৃতি প্রবৃত্তি সব বহিয়া চলিয়াছে। সেই জন্যই বংশানুক্রম সত্য। কিন্তু রেতবিন্দুর মধ্যে প্রজ্ঞাপুরুষ যদি না লুকান থাকিত, তবে বংশের ধারা বলিয়া কিছু সম্ভব হইত না, তাহার কোন রকম সদর্থও পাওয়া যাইত না। মানুষের দেহে প্রাণে মনেও রহিয়াছে ঐ একই প্রজ্ঞার চাপ। প্রজ্ঞাপুরুষের ধাক্কা শরীরের উপর আসিয়া পড়িয়াছে বলিয়া, শরীরের উপর আপনাকে চিহ্নিত করিয়া দিয়াছে বলিয়া, শরীরের মধ্যে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছে বলিয়া, শরীরে ব্যক্ত হইয়াছে মানুষের ব্যক্তিত্ব। বিবর্ত্তনের ক্রমোন্নতির যে বিশেষ ভাবধারা লইয়া গঠিত হইয়াছে আমার আমিত্ব। কোন দুইটি মানুষের দৈহিক আকৃতি, মুখের ভাব বা আঙ্গুলের টিপ ঠিক এক রকমের নয়; মানুষের প্রত্যেকটি অঙ্গ কোন না কোন প্রকারে তাহার বিশেষত্বটি ফুটাইয়া ধরিতেছে। মানুষের প্রাণে ও মনেও নিগূঢ় পুরুষের প্রভাব ধরা দিতেছে; এই জন্যই, মানুষ হিসাবে পরিবার হিসাবে দেশ হিসাবে মানুষের মধ্যে এক একটা ব্যক্তিত্ব গড়িয়া উঠিয়াছে—তাহারা চলে বিশেষ বিশেষ চিন্তার অনুভবের ধারায়; এই জন্যই তাহাদের এক দিয়া সাদৃশ্য আর এক দিয়া পার্থক্য। এই জন্যই মানুষে মানুষে যে আদান-প্রদান হয় তাহা কেবল শারীরিক নয়, তাহা আবার আধ্যাত্মিক,

মানসিক, নৈতিক। কারণ, সকল জীবের মধ্যে রহিয়াছে একই প্রজ্ঞাপুরুষ—শুধু বিভিন্ন ভাবে, বিভিন্ন ভাবের অনুযায়ী বিভিন্নরূপে সেটিকে তাহারা ব্যক্ত করিয়া চলিয়াছে। প্রজ্ঞা-পুরুষের তপঃপ্রভাব আবার ঘটনাবলীর মধ্য দিয়া, জগতের বিপুল গতিধারার মধ্য দিয়া আপনাকে প্রকাশ করিতেছে। ইহাকেই ইউরোপীয়েরা বলিয়া থাকে 'জাইটগাইষ্ট' (Zeitgeist) বা কালপুরুষ। যুগ-প্রবাহের ভিতর দিয়া জ্যোতিষ্কাবলীর পরিক্রমণের তাহারই ইচ্ছা প্রকট হইয়া চলিয়াছে। তাহারই কল্যাণে ভিতর দিয়া ক্রমপরিণতি সম্ভব হইতেছে, এই ক্রম-পরিণতির একটা লক্ষ্য, উপায় ও ধারাও নির্দ্দিষ্ট হইযাছে। "শাশ্বত কাল ব্যাপিয়া যিনি সকল জিনিষ নির্দ্দোষভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়া ধরিয়াছেন, তিনিই এই পুরুষ।"

বেদান্তের যে আদিরূপ উপনিষদ হইতে আমরা শিখিয়াছি তাহা এই। অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত বা দ্বৈত—এই যত মতবাদ সবই একের সহিত বহুর যে সম্বন্ধ তাহা দেখিবার বিভিন্ন ভঙ্গী-মাত্র; কোন বিশেষ মতবাদকেই বেদান্ত নাম দিয়া চালাইবার কাহারও অধিকার নাই। অদ্বৈতবাদ সত্য, কারণ বহু হইতেছে একেরই প্রকাশ; বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ সত্য, কারণ সব মূল-ভাবই সনাতন, একবার যখন তাহাদের প্রকাশ হইয়াছে, পূর্ব্বেও তবে তাহাদের প্রকাশ ছিল, ভবিষ্যতেও তাহারা প্রকাশ পাইবে —একের মধ্যে থাকিয়াই বহু সনাতন, তবে কখনও তাহারা ব্যক্ত, কখন অব্যক্ত; দ্বৈতবাদও সত্য, কারণ এক দিক হইতে

দেখিলে এক ও বহু মূলতঃ যেমন চিরকালই এক অভিন্ন, তেমনি অন্য দিক হইতে দেখিলে, প্রকাশের মধ্যে ভাবের যে ব্যক্ত রূপ তাহা, ভাব ব্যক্ত হয় যে প্রজ্ঞার মধ্যে তাহা হইতে চিরকালই ভিন্ন। একত্ব যদি নিত্য সনাতন অপরিবর্ত্তনীয়, তবে দ্বৈতও দেখি তাহার মধ্যে চিরকাল ধরিয়া পুনঃ পুনঃ প্রকাশ পাইতেছে। আত্মা অনন্ত, অসীম, সনাতন; অপার আকাশ অসংখ্য সত্তায় পরিপূর্ণ করিয়া দিবার জন্য আত্মার প্রকাশের আবেগও অনন্ত, অসীম. সনাতন।

ব্যষ্টির মহত্ত্ব

সকল আন্দোলনের মানুষের সকল রকম বৃহৎ প্রয়াসের মধ্যে যুগের ধর্ম্ম আপনাকে প্রকাশ করিয়া ধরিতেছে—ইউরোপ ইহাকেই বলে 'জাইটগাইষ্ট,' ভারতবর্ষ বলে "কালপুরুষ"। নামেই জিনিষটির সম্যক পরিচয়। 'কালী', বিশ্বের জননী, বিশ্বের ধ্বংসকর্ত্রী যিনি, তিনি হইতেছেন শক্তি—অর্থাৎ যে-শক্তি মানবজাতির হৃদয়-কন্দরে কাজ করিয়া চলিয়াছে, ব্যক্তির প্রতিষ্ঠানের আন্দোলনের নিত্য উত্থান-পতনের ভিতর দিয়া আপনাকে প্রকাশ করিয়া চলিয়াছে; আর 'মহাকাল' হইতেছেন ভিতরের পুরুষ, তাঁহারই তপোবল শক্তির মধ্যে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে, জগতের প্রগতি, জাতির ভাগ্য গড়িয়া তুলিতেছে মহাকালেরই প্রেরণা কালের ধারায় সার্থক ও সফল হইতেছে। একবার একটা আন্দোলন যদি সচল হইয়া উঠিল, তবে অন্তর-পুরুষের প্রেরণা, কাল আর শক্তি তাহার ভার গ্রহণ করিবেই, তাহাকে গড়িয়া, পরিণত করিয়া, পূর্ণ করিয়া তুলিবেই। যুগধর্ম্ম, কালের ধারায় মূর্ত্ত ভগবান যখন একটা বিশেষ দিকে চলিতে সুরু করিয়াছে, তখন বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় শক্তি সম্মিলিত হইয়া সেই স্রোতকে উপচিত করিয়া ধরিবে, পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট গন্তব্যেরই দিকে সজোরে তাহাকে চালাইয়া লইবে। স্বেচ্ছায় যাহারা সাহায্য করিবে তাহারা ত স্রোতের গতি

বাড়াইয়া তুলিবেই, যাহারা বাধা দিবে তাহারাও দ্বিগুণ বাড়াইয়া তুলিবে। ঝাত্যাবিক্ষুব্ধ সাগরের বুকে তরঙ্গের মত, নিভৃত উৎসের প্রেরণা একবার উঠিতেছে আর একবার পড়িতেছে—এই বিজয়ের ঋদ্ধির সমুচ্চ শিখরে আরূঢ়, এই আবার পরাজয়ের হতাশার গহ্বরে নিমজ্জিত, তবুও সে অব্যর্থভাবে আপন অনিবার্য্য সিদ্ধিরই দিকে ছুটিয়া চলিতেছে। মানুষ তাহাকে সাহায্য করিতে পারে, মানুষ তাহাকে বাধাও দিতে পারে, কিন্তু কালের গতি সকলকে আপন কুক্ষিগত করিয়া অভীষ্ট কর্ম্ম যথেচ্ছ করিয়া চলিয়াছে।

এই মহাসত্যটির একটা গভীর উপলব্ধি যে মানুষের অন্তরে আছে তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ পাই গীতায়, যেখানে শ্রীকৃষ্ণ আপনার বিশ্বরূপ প্রকট করিয়া বলিলেন, তিনি হইতেছেন "লোকক্ষয়কারী কাল"। অর্জুন যখন তাঁহার গাণ্ডীব ফেলিয়া দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "মানুষকে, ভাই-বন্ধুকে, গুরুজনকে হত্যা করা—কি মহাপাপে আমি লিপ্ত হইতেছি; আমার দ্বারা এ কার্য্য হইবে না," শ্রীকৃষ্ণ তখন প্রথমে বিচারের পথে তাহার ভুল দেখাইয়া দিলেন, তারপর একাদশ অধ্যায়ে বর্ণিত সেই অদ্ভুত বিশ্বরূপ দর্শনের দ্বারা অর্জুনের মানসপটে জগতের আসল সত্য কি তাহা গভীরভাবে অঙ্কিত করিয়া দিলেন। ভগবানের মুখনিঃসৃত সেই রুদ্রবাণী বলিতেছে—

কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো
লোকান্ সমাহর্ত্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।

ব্যষ্টির মহত্ত্ব

ঋতেঽপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্ব্বে
যেঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ ॥
তস্মাৎ ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব
জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধং।
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব
নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্ ॥

"কাল আমি, বিশ্বের ধ্বংস-সাধন আমার কার্য্য। এই যে পূর্ণ শক্তিতে আমি প্রকাশিত হইয়াছি, যাবতীয় লোক কবলিত করিয়া চলিয়াছি। তোমার সহায় ব্যতিরেকেও, যত দেখিতেছ যোদ্ধারা দলবদ্ধ হইয়া পরস্পরের সম্মুখীন তাহাদের কেহই থাকিবে না। তবে উঠিয়া দাঁড়াও, যশ অধিকার কর, শত্রুকে জয় কর, সমৃদ্ধ রাজ্য উপভোগ কর। ইহাদের সকলকে আমি পূর্ব্ব হইতেই নিহত করিয়াছি—হে সব্যসাচী, তুমি শুধু হও নিমিত্ত।"

কালের মন্থর গতিধারারূপে শ্রীকৃষ্ণ এখানে প্রকটিত হন নাই, বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া যে কাজ নিভৃতে প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে তাহাকে এক মুহূর্ত্তের মধ্যে শেষ করিয়া ধরে যে কালপুরুষ সেই মূর্ত্তি লইয়া শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন। কুরুক্ষেত্রের দারুণ বিপর্য্যয় ঘটাইবার জন্যই সমস্ত অতীত একমুখী হইয়া চলিয়াছিল। মানুষে তাহা জানিতে পারে নাই; সেই বিপদ নিবারণ করিবার জন্য যাহারা হয়ত সব-কিছু করিতে প্রস্তুত ছিল, তাহারাও তাহাদের

উদ্যোগের ভিতর দিয়া, এমন কি তাহাদের নিশ্চেষ্টতার ভিতর দিয়াই অনিবার্য্যকে ডাকিয়া আনিয়াছে। ভবিতব্যকে যাহারা অস্পষ্টভাবে দেখিতে পাইয়াছিল, তাহারা বৃথাই কাল-চক্রের গতিকে থামাইয়া রাখিতে প্রয়াস পাইয়াছিল। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও নিষ্কাম কর্ম্মযোগীর কর্ত্তব্যবোধে ফলাকাঙক্ষাশূন্য হইয়া সেই নিষ্ফল চেষ্টায় হস্তিনাপুরে দৌত্যকার্য করিতে গিয়াছিলেন। ঘটনার পরে তবে সকলের চক্ষু ফুটিয়াছিল, তাহারা দেখিল, নদনদী যেমন সমুদ্রের দিকে ছুটিয়া চলে, পতঙ্গ যেমন বহ্নিশিখার দিকে উড়িয়া চলে, সেই রকম তখন-কার যুগের সেই গরিমাময় শক্তিমান দাম্ভিক ভারতখণ্ড, তাহার রাজন্যবর্গ, রথরথী, সৈন্য-সামন্ত, অস্ত্রশস্ত্র সমস্ত লইয়া কাল-পুরুষের ব্যাদিত আস্যে কবলিত করাল দ্রংষ্ট্রায় চর্ব্বিত হইবার জন্যই ধাইয়া চলিয়াছে। ভগবানের লীলায় একটা ধারা যেমন সুন্দর মধুর, আর একটা ধারা আবার তেমনি ক্রূর ভীষণ। বৃন্দাবনের রাসলাস্যকে সম্পূর্ণ করিয়া ধরিয়াছে কুরুক্ষেত্রের প্রলয় তাণ্ডব। উভয়ে মিলিয়া তবে সৃষ্টির ধারায় সে বৃহৎ সে মহান সমন্বয় সাধন করিয়া চলিয়াছে। জগতের ক্রমো-ন্নতি অর্থই দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়া ঐক্যে পৌঁছান, দ্বেষ ও হিংসার ভিতর দিয়া প্রীতি ও মিলনে পৌঁছান—ক্রমোন্নতির পূর্ণ সার্থকতা আসিবে তখন যখন পাপ দুঃখ দৈন্য রূপান্তরিত হইয়া উঠিবে, তাহাদের পরিবর্ত্তে আসিবে কল্যাণ, আনন্দ, সৌন্দর্য্য—"শিবং শান্তং শুদ্ধং আনন্দং"।

কালপুরুষের উদ্দেশ্যে কে বাধা দিবে? সেই যুগের ভারতবর্ষে শক্তিমান পুরুষ শত শত ছিল—মহা দার্শনিক ও যোগী, সূক্ষ্মবুদ্ধি রাজনীতিজ্ঞ, মানুষের নেতা, চিন্তার কর্ম্মের বীর ছিল অগণিত; একটা বিরাট শিক্ষা ও দীক্ষা তাহার পূর্ণ প্রতিভা লইয়া বিকশিত; তখনকার মানুষ যেন এক একজন দিকপাল। দেখিয়া মনে হয়, ইহাদের কয়েকজনা যদি এদিকে না চলিয়া একটু ওদিকে ঘুরিয়া চলিত তবে আর কুরুক্ষেত্রের প্রলয়কাণ্ড কিছুই ঘটিত না। অর্জুন ঠিক এই কথা ভাবিয়াই তাঁহার ধনুঃশর ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছিলেন। পাণ্ডবদের তিনিই একমাত্র ভরসা, তাঁহাকে বাদ দিয়া জয়লাভ একটা স্বপ্ন, যুদ্ধ করাও বাতুলতা মাত্র। কিন্তু আশ্চর্য্য! কালপুরুষ বাছিয়া বাছিয়া তাঁহারই কাছে জলদগম্ভীর স্বরে ঘোষণা করিল, অতি বড় বলীয়ান যে তাহারও কোন ক্ষমতা নাই, বিধির বিধান নিষ্পন্ন হইবেই হইবে। "তুমি যদি সরিয়াই দাঁড়াও, তবুও এই যত দেখিতেছ যোদ্ধারা ব্যূহবদ্ধ হইয়া পরস্পরের সম্মুখীন তাহাদের একজনও রক্ষা পাইবে না।" কারণ, এই সব মানুষ কেবল শরীরে বাঁচিয়া আছে; কিন্তু পিছনে যে শক্তি বর্ত্তমান, যাহাই সার্থকতা চাহিতেছে তাহার কাছে ইহারা সকলেই মৃত। ভগবান যাহাকে রক্ষা করিতেছেন, কে তাহাকে মারিতে পারে? ভগবানই যাহাকে মারিয়া রাখিয়াছেন, তাহাকে রক্ষা করিবে কে? যে-মানুষ হত্যা করে সে নিমিত্তমাত্র, যন্ত্রমাত্র—তাহাকে অবলম্বন করিয়া যবনিকার অন্তরালে যে ঘটনা নিষ্পন্ন

হইয়া গিয়াছে তাহাই আবার যবনিকার এই দিকে নিষ্পন্ন ঘটনা হইয়া দেখা দেয়। কুরুক্ষেত্রের বিরাট ধ্বংসকাণ্ডে যে সত্য পাই, তাহা এই জগতের যে-কিছু কাজ, বিশ্বলীলার অন্তর্গত সমস্ত সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

বীর যাহারা তাহাদের জন্যই এই বীরভাবের সাধনা। বিপুল কিছু পরিবর্ত্তন ঘটাইবার জন্যই যাহাদের পৃথিবীতে আবির্ভাব, তাহারা কালপুরুষের শক্তিতে শক্তিমান। কালী তাহাদের অধিকার করিয়াছেন; যে মানুষকে কালী অধিকার করিয়াছেন সে সম্ভব বা অসম্ভব, যুক্তি বা তর্কের কোন তোয়াক্কা রাখে না। কালী হইতেছেন প্রকৃতির শক্তি, যে-শক্তি শিশুর হস্তে কন্দুকের মত জ্যোতিষ্কমণ্ডলীকে তাহাদের আপন আপন কক্ষে ঘুরাইয়া লইয়া চলিয়াছে; সে-শক্তির কাছে অসম্ভব কিছু নাই। তাহা "অঘটন-ঘটন-পটীয়সী"—অসম্ভবকে সম্ভব করিতে পরম দক্ষ; তাহা "দেবাত্ম-শক্তি স্বগুণৈর্নিগূঢ়"—আপন কর্ম্মধারার বিভিন্ন ভাবের মধ্যে লুকাইয়া আছে ভগবানেরই যে-শক্তি। আপন নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম সম্পাদন করিতে সে-শক্তির এক সময় ছাড়া আর কিছুই প্রয়োজন হয় না। কালীর গতি কালের মধ্য দিয়া—সে গতি আপনা হইতেই আপন সার্থকতার দিকে চলিতেছে, নিজের উপায় সৃষ্টি করিতেছে, উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতেছে। একজন মানুষকে ভর করিয়া তিনি কাজ করিয়া চলিয়াছেন, আর এক জনকে তিনি ভর করেন নাই—ইহা শুধু অকারণ খেয়াল মাত্র নহে।

উপযুক্ত আধার বোধেই বিশেষ ব্যক্তিকে তিনি বরণ করিয়াছেন : আর একবার যাহাকে তিনি বরণ করিয়াছেন তাহাকে তিনি ছাড়িয়া যান না বা ছাড়িতেও দেন না—যতক্ষণ তাঁহার উদ্দেশ্য সংসিদ্ধ না হইতেছে।

তাই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিতেছেন—

যদহংকারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে।
মিথ্যৈব ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিয়োক্ষ্যতি ॥

"অহংকারের আশ্রয় লইয়া তুমি যে ভাবিতেছ 'আমি যুদ্ধ করিব না,' মিথ্যা তোমার এই সঙ্কল্প ; প্রকৃতি তোমাকে কর্ম্মে নিযুক্ত করিবেই করিবে।" যখন দেখা যায় কর্ম্মী তাহার কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহার অর্থ সে কর্ম্মীর কাজ শেষ হইয়াছে, কালী তাহাকে ছাড়িয়া আর একজনার কাছে চলিয়াছেন। কোন বৃহৎ কর্ম্ম করিয়াছে এমন মানুষ যদি শেষে ধ্বংস পায়, তবে বুঝিতে হইবে তাহার কারণ অহংকার—অহংকারের বশবর্ত্তী হইয়া ভিতরকার শক্তির অপব্যবহার করিয়াছিল বলিয়া শক্তি তাহাকে ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিয়া দিয়াছেন। মহাবীর নেপোলিয়ানকেও শক্তি এইভাবে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিল, চূর্ণ করিয়া দিয়াছিল। কোন যন্ত্রকে যত্নে বাঁচাইয়া রাখা হয়, কোন যন্ত্রকে আবার টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিয়া দেওয়া হয়—কিন্তু সকলেই যন্ত্রমাত্র। মহাপুরুষের মহত্ত্ব এইখানে—নিজেদের সামর্থ্য দিয়া যে তাহারা বিরাট ঘটনাবলী কিছু নিয়ন্ত্রিত করে, এমন নয় ; কিন্তু বিরাট ঘটনাবলী নিয়ন্ত্রিত

করে যে-মহাশক্তি তাহারই ব্যবহারে আসিবে বলিয়া তাহার নিজের হাতে গড়া যন্ত্র তাহারা। মিরাবো ফরাসী বিপ্লবকে স্বষ্টি করিতে যতখানি সাহায্য করিয়াছিলেন, এমন আর কেহ করে নাই। কিন্তু তিনি যখন বিরোধী হইয়া দাঁড়াইলেন, রাজতন্ত্রের পৃষ্ঠপোষক হইয়া বিপ্লবের চক্র পিছনে টানিয়া ধরিতে চেষ্টা করিলেন, তখন ফরাসী দেশের বীরশ্রেষ্ঠের এই কার্পণ্যের জন্য ফরাসী বিপ্লব কি থামিয়া রহিল? কালীর পদভার মিরাবোর উপর পড়িল—মিরাবো অপসৃত হইলেন। বিপ্লব কিন্তু তেমনি অগ্রসর হইয়া চলিল—কারণ সে-বিপ্লব কালপুরুষের প্রকাশ, স্বয়ং ভগবানের এষণা।

সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে ইহাই হইতেছে। গোড়ায় একটু কিছু হাত আছে বলিয়া যাহারা গর্ব্বে ফুলিয়া উঠিয়া মনে করে ঘটনাবলী তাহাদেরই স্বষ্টি, তাহারা কালের গহ্বরে তলাইয়া যায়, তাহাদের ছিন্ন-ভিন্ন খ্যাতিকে পদদলিত করিয়া দিয়া নূতন মানুষ অগ্রসর হইয়া চলে। অন্তর্নিহিত কালীর প্রেরণা যাহাদিগকে ছুটাইয়া লইয়াছে, তাহারা নিয়তির সহিত কোন প্রকার বখরাই করে না, একমাত্র তাহারা শেষ পর্য্যন্ত টিকিয়া থাকে। ব্যষ্টির মহত্ত্ব হইতেছে ব্যষ্টির অন্তরস্থ মহাশক্তির মহত্ত্ব।